সন্তানের শ্রেষ্ঠ উপহার

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

ভূমিকা

ছেলে-মেয়ে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে অনেক মা-বাবাই আজ পেরেশান। কেউ পেরেশান এজন্য যে, অজস্র টাকা-পয়সা খরচ করে সন্তানকে শিক্ষিত করে পিতা-মাতা তার কাছে আজ অবজ্ঞার শিকার। আবার অনেকে এজন্য পেরেশান যে, সন্তান বিপথে চলে যাচ্ছে, চরিত্রহীন আর বখাটে হয়ে যাচ্ছে, বংশের মুখে কালিমা লেপন করছে। অবশ্য এমন দীনদার মা-বাবাও আছেন যারা চান তাদের সন্তান নামাযী হোক, দীনদার হোক, দীনের পথে চলুক, জান্নাতের আমল করুক। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা মা-বাপের এ আকাঙ্খা পূরণ না করে বরং প্রগতির উল্টো স্রোতে গা-ভাসিয়ে দিয়ে জাহান্নামের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্য তারা সন্তানের ব্যাপারে পেরেশান।

কিন্তু ছেলে-মেয়েরা কেন পিতা-মাতাকে অবজ্ঞা করছে, কেন তারা বিপথে কুপথে চলছে, পিতা-মাতার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেন সন্তানরা নামাযী হচ্ছে না, দীনদার হচ্ছে না, তা তলিয়ে দেখা দরকার। অবশ্য আমাদের সমাজ আজ ভিন্ন চিত্রও দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল সন্তান অবাধ্য হওয়ার কারণে, বিপথগামী হওয়ার কারণে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন যতটুকু মনঃক্ষুন্ন হন, সন্তান ধর্ম বিমুখ হয়ে গেলে, আল্লাহ ও তার রাসূলের শিক্ষা থেকে দুরে সরে গেলে বা নাস্তিক-মুরতাদদের পথে চললে কিন্তু পিতা-মাতা ততটুকু নাখোশ হন না। এমন কি অনেক পিতা-মাতা জানেনই না যে, সন্তানের জন্য তার কি করণীয় রয়েছে।

তাই সন্তানদেরকে সুপথে আনতে হলে, তাদেরকে আদর্শ সন্তানরূপে গড়তে হলে, পিতা-মাতার কি করণীয় ও যিম্মাদারী তা জানা অত্যাবশ্যক। এ সকল যিম্মাদারী ঠিকমত আদায় করলেই সন্তানরা কাঙ্খিত সুসন্তানরূপে পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করবে। আর এ সন্তানই দুনিয়া ও আখিরাতে পিতা-মাতার শান্তি ও সুখের মাধ্যম হবে। সন্তানের উসীলায় কিয়ামতের দিন পিতা-মাতা নাজাত পাবে। বস্তুতঃ সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার জন্য যবরদস্ত নিয়ামত, যা তাঁর দুনিয়া, কবর ও আখিরাতের সকল ঘাটিতে কাজে আসবে- যদি নাকি তারা সন্তানকে সুশিক্ষা তথা দীনী শিক্ষা ও কুরআনী তালীম দিয়ে থাকেন। নতুবা এসব সন্তানরাই প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য বিপদ ও আযাবের কারন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ সন্তানরা পিতা-মাতার হাতে আমানত। তারা আল্লাহ তা'আলার এ আমানতের যথাযথ কদর না করলে পরকালে নিঃসন্দেহে জবাবদিহীর সম্মুখীন হবে। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতারই এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য।

দীনের ইলম না থাকার কারণে অসংখ্য পিতা-মাতা নিজেদের এবং সন্তানদের কল্যাণ কামনায় ভুল পথে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ কেউ হাসিল করতে পারছে না, বরং সমস্যা দিন দিন আরো ঘোরতর হচ্ছে। অতএব, মূল সমস্যা কি তা জেনে সঠিক পথে সন্তানদের পরিচালনা করতে হবে। সময় ও সুযোগ থাকতেই এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা অতি আবশ্যক।

এদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা সন্তানের কল্যাণ কামনার প্রকৃত স্বরূপ কি হবে, কোন পথে তাদেরকে পরিচালিত করলে তারা আমাদের উভয় জাহানের সফলতার প্রতীক হবে, পিতা-মাতার উপরে সন্তানের হক কি, এসব বিষয়গুলো বিশদভাবে অত্র পুস্তকে আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছি। আশা করি- এ পুস্তক সকল পিতা-মাতার জন্য সন্তানদের মানুষ করার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিবে। আল্লাহ পাক আমাদের এ মেহনতকে কবুল করুন এবং সকল পিতা-মাতাকে কল্যাণের সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন ।(আমীন)

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্টা
সন্তানের শ্রেষ্ঠ উপহার	৭
সন্তানদের ব্যাপারে পিতা-মাতার আসল ফিকির	৮
অন্যান্য ব্যাপারে ফিকির	৮
সন্তানকে ইলমেদীন শিক্ষা দেয়ার হিকমত	৯
সন্তানরা ধর্ম বিমুখ কেন হচ্ছে	১০
ইলমেদীনের গুরুত্ব ও ফযীলত	১২
দীনী ইলম শিক্ষা করার ফায়দা	১৩
সন্তানরা পিতা-মাতার বেহেশত-দোযখের সামান	১৯
পিতামাতার হক সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশনা	২০
আগে দীনী ইলম শিক্ষা তারপর পার্থিব শিক্ষা	২৮
ইলম বাদ দিয়ে পার্থিব শিক্ষা জায়িয নয়	২৯
দীন না শিখে পার্থিব বিদ্যা অর্জনের অশুভ পরিনতি	৩৩
সন্তানকে ইলমেদীন শিক্ষা না দেয়ার ক্ষতি	৩৫
পরকালীন তথা কবর ও হাশরের ক্ষতি	৪১
একটি ভ্রান্তির অপোনোদন	৪৬
ইংরেজী শিখে ইংরেজ বনা নাজায়িয	৪৯
কতটুকু ইল্‌ম ফরজে আইন	৫৮
ইলম হাসিলের উপায় উপকরণ	৫৯
ইলমী প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায়	৬০
মাদ্রাসা সমূহের যিম্মাদারী	৬৫
মাদ্রাসার বুনিয়াদী দায়িত্ব	৬৫
মাদ্রাসা সমূহের আনুষঙ্গিক যিম্মাদারী	৬৬
মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র	৭৩
শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর সুপারিশ	৭৪
থানবী রহ.-এর দিক নির্দেশনা	৭৮
পুরুষদের কর্মসূচী	৭৮

باسمه تعالى

সন্তানের শ্রেষ্ঠ উপহার

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقرة:)١٣٣

"তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন হযরত ইয়াকুব আ. দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন এবং যখন তিনি নিজের পুত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, তোমরা আমার ইন্তিকালের পর কার ইবাদত করবে? তারা সকলেই জবাব দিলেন-আমরা ঐ মহান সত্তার ইবাদত করব, যে সত্তার ইবাদত আপনি করতেন এবং আপনার পূর্বে আপনার মুরব্বীবর্গ হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আ. করতেন, অর্থাৎ ঐ মা' বুদেরই ইবাদত করব, যিনি এক, যার কোন শরীক নেই। আর আমরা ঐ আল্লাহর আনুগত্যের উপর সুদৃঢ় থাকব।" (সূরাহ বাকারা, আয়াত-১৩৩)

উল্লেখিত আয়াতের পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আ.ও মৃত্যুর পূর্বে সন্তানকে এই একই ওসীয়ত করেছিলেন। উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বারা সাধারণ মানুষ এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। সাধারণ মানুষদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মাল-দৌলতের গুরুত্ব ও চিন্তা সর্বাধিক থাকে। এ কারণে মৃত্যুর পূর্বে তারা কামনা করে যে, বড় বড় সম্পদ-যা তার নিকট আছে, সন্তানদের দিয়ে যাবে এবং চায় যে, তারা এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করবে। উক্ত প্রেক্ষাপটে একজন কোটিপতি বা শিল্পপতির আকাঙ্খা থাকে যে, আমার সন্তানরা মিল ফ্যাক্টরিসমূহের মালিক হবে এবং তাদের এক্সপোর্ট ও ইমপোর্টের বড় বড় লাইসেন্স থাকবে, লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স তাদের থাকবে। এরূপ একজন উচ্চপদস্থ পিতার বাসনা থাকে যে, তার ছেলেও উচ্চ পদ হাসিল করবে এবং অনেক বড় অংকের বেতনের মালিক হবে ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের নজরে সর্বাধিক গুরুত্ব পেত প্রকৃত দৌলত তথা ঈমান ও আমালে সালিহ। এ কারণে মৃত্যুর পূর্বে তাদের এবং তাঁদের অনুসারীদের মনের একান্ত খায়েশ এ ছিল যে, যে জিনিসকে তারা প্রকৃত স্থায়ী ও সর্বাধিক দামী দৌলত বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, সেই দৌলত তাদের সন্তানদের হাসিল হয়ে যাক। এজন্য তারা আজীবন সন্তানদের ঐ দৌলত হাসিল হওয়ার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা-মেহনত সন্তানদের জন্য করতে থাকতেন। আর যিন্দেগীর শেষ মুহূর্তেও অত্যন্ত তাকীদের সাথে ঐ দৌলতের ওসীয়ত করে যেতেন। যেমন উল্লেখিত দুই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

সন্তানদের ব্যাপারে পিতা-মাতার আসল ফিকির

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. উল্লেখিত আমলের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার উপর ফরজ এবং সন্তানের অন্যতম হক হলো-সর্ব প্রথম তাদের জন্য প্রকৃত ও স্থায়ী দৌলত এবং আসল কল্যাণ ও কামিয়াবীর ফিকির ও ব্যবস্থা করা অর্থাৎ সন্তানদেরকে কুরআনে কারীম ও দীনে ইসলাম-এর জরুরী বিষয় সমূহ শিক্ষা দেয়া, যে মালিক সব ধরণের নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন, তার যথার্থ বন্দেগী ও গোলামীর জন্য ইলমে দীন শিক্ষা দেয়া, যাতে করে দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতের ভাণ্ডার তাদের জন্য জারী থাকে এবং আসল মালিকের গোলামী ও বন্দেগীর ইলম না থাকায় তাঁর নাফরমানীর দরুন তাদের নিয়ামত সমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হতে না হয় ।

অন্যান্য ব্যাপারে ফিকির

সন্তানকে আসল দৌলত দেয়ার পর তার ব্যাপারে অন্যান্য জায়িয ফিকির করতে নিষেধ নেই । যেমন, সন্তানকে ফরজে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষাদেয়ার পর কেউ যদি সন্তানকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বানায় বা অন্য কোন জায়িয পেশা শিক্ষা দেয়, তাহলে এর মধ্যে কোন খারাবী নেই।

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বপ্রথম নিজের সন্তানকে কুরআন ও সুন্নাহর তালীম দিয়ে দীনদার পরহেজগার বানাতে হবে। তারপরে অন্য সব ব্যাপারে ফিকির করা যাবে। এরূপে স্বীয় সন্তানদের দীন শিক্ষার ব্যাপারে আগে ফিকির করতে হবে। এরপর অন্যদের দীনী শিক্ষার ব্যাপারে ফিকির করবে। নিজের সন্তানদের ব্যাপারে ফিকির না করে এবং তাদেরকে মাহরূম করে শুধু অন্যদের ব্যাপারে ফিকির করা আম্বিয়ায়ে কিরামের তালীমের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। নিজের সন্তানদের ও পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক ফিকির ও প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকগুলো হিকমত আছে।

সর্বাগ্রে নিজের সন্তানকে ইলমে দীন শিক্ষা দেয়ার হিকমত সমূহ

প্রথম হিকমতঃ পিতা-মাতার সাথে রক্তের সম্পর্কের কারণে পিতা-মাতার নসীহত সন্তানেরা সহজে এবং তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে। পিতা-মাতার কথাবার্তা, নিয়ম নীতি, জীবন পদ্ধতি সন্তানের জন্য পাথেয় হয়। এ জন্যই পিতা-মাতা দীনদার ও দীনের খাদেম হলে, সন্তানেরাও তাদের মত সে পথের পথিক হয়ে থাকে, আর পিতা-মাতা বেনামাযী ও নাফরমান হলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানরাও সেরূপ হয়ে থাকে। এমন কি কেউ তাদেরকে নামায পড়ার নসীহত করলে বা সৎপথে চলতে বললে তারা তা গ্রহণ করতে চায় না, বরং তারা ভাবতে থাকে বা অনেক ক্ষেত্রে বলে ফেলে যে, নামায-রোযা কোন জরুরী জিনিষ নয়। এগুলো জরুরী হলে আমার জ্ঞানী ও শিক্ষিত পিতা-মাতা অবশ্যই এগুলো করতেন, এগুলোতে তারা কখনো অলসতা করতেন না।

দ্বিতীয় হিকমতঃ পৃথিবীতে আল্লাহর দীন কায়িম করতে এর চেয়ে সহজ কোন পদ্ধতি হতে পারে না যে, প্রত্যেকে নিজের সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থদের দীনের তালীমের

ব্যাপারে ফিকির করবে। এরূপে সবাই ফিকির করলে, এর দ্বারা পূর্ণ সমাজ তথা সমগ্র পৃথিবী দীনের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে এবং পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে জান্নাতী পরিবেশ। জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা এবং অনাবিল শান্তি। এ জন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (: التحريم:٦)

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করো ।” (সূরা তাহরীম-আয়াত ৬)

অন্য আয়াতে নির্দেশ এসেছে-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طه: ١٣٢)

“তোমরা নিজের পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিতে থাকো এবং নিজেও নামাযের পাবন্দী করতে থাকো। তোমরা অনেক মাল ও দৌলত জমা করবে, এটা আমি তোমাদের নির্দেশ দেইনি; রিযিক তো আমিই তোমাদের দান করবো; জেনে রেখো, কামিয়াবী শুধু মাত্র মুত্তাকীদের জন্যই। তোমাদের ধারণা মত মাল-দৌলত, মিল-ফ্যাক্টরী, বড় বড় পদের মধ্যে কামিয়াবী নেই।” (সূরা ত্বহা, আয়াত ১৩২)

তৃতীয় হিকমতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির সন্তানাদি ও পরিবারবর্গ চিন্তাধারা ও আমল আখলাকে তার মত না হয় এবং তার রঙ্গে রঙ্গীন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির ওয়াজ-নসীহত অন্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। এ জন্যই ইসলামের শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের উত্তরে সাধারণ লোকেরা বলেছিলেন -প্রথমে আপনি স্বীয় গোত্রকে ঠিক করেন তারপর আমাদেরকে বলবেন। পরবর্তীতে দেখা গেছে, ফাতহে মক্কার পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল গোত্র যখন ইসলাম কবুল করে নিয়েছে, তখন মক্কার আশে পাশের সকল গোত্র দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে চলেছে।

যেমন-আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন-

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر:٢)

“লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করবে” (সূরা নাসর, ২)

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন গোত্র স্বেচ্ছায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে ইসলাম কবুল করায় সে বৎসরের নাম হয়েছে “সানাতুল উফুদ” অর্থাৎ গোত্র প্রতিনিধিদের আগমনের বৎসর।

সন্তানরা ধর্ম বিমুখ কেন হচ্ছে

বর্তমানে মুসলমানদের সন্তানদের মধ্যে যে দীনী দৈন্যতা ও বদদীনের সয়লাব প্রবাহিত হওয়া দেখা যাচ্ছে এবং তারা যে ইংরেজ-খৃষ্টান, কাফির-মুশরিকদের অন্ধ

অনুকরণের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নতি ও প্রগতির স্বপ্ন দেখছে, এর বড় কারণ-অধিকাংশ মুসলমান পিতা-মাতার উদাসীনতা। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখে না।

এমন কি ইসলামের যথার্থ স্বরূপ জানতেও চেষ্টা করে না। আর যারা জানে, তারা অনেকে নিজে দীনদার পরহেজগার, কিন্তু তারা নিজের সন্তানদেরকে দীনদার বানানোর ফিকির করে না। তারা এ খায়েশও রাখে না যে, আমাদের সন্তানেরাও দীনদার হয়ে প্রকৃত কল্যাণ এবং স্থায়ী শান্তি হাসিল করুক, তাদের ঈমান-আক্বীদা, আমল-আখলাক দূরস্থ হয়ে যাক এবং তারা মন্দ পথ থেকে এবং গুনাহর রাস্তা থেকে বেঁচে থাকুক। অথচ এটাই ছিল সন্তানের প্রতি প্রকৃত মুহাব্বত এবং আসল কল্যাণ কামনা। এটা কোন বুদ্ধিমানের কথা নয় যে, কোন ব্যক্তি নিজের সন্তানকে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য শক্তি ব্যয় করবে, আর দোযখের ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না। সরকারের জেল-হাজত থেকে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য তার আরাম হারাম হয়ে যায়, অথচ আল্লাহর আযাবের জেল থেকে বাঁচানোর জন্য কোন তৎপরতা নেই। তাহলে তাদের নজরে কি জেলখানা থেকে জাহান্নামের শাস্তি হালকা, না কি জান্নাত-জাহান্নাম ও আখিরাতের প্রতি তাদের বিশ্বাসে কোন গড়বড়ি আছে? নতুবা একজন মুসলমানের জন্য কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, সে ছেলের আখিরাতের কল্যাণকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে তার কয়েক দিনের আরামের জন্য সব শক্তি ব্যয় করবে? আর এর জন্য জায়িয-নাজায়িয সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

এমন কি অনেকে-নিজের কলিজার টুকরা আল্লাহ্‌র দেয়া মহা দৌলত সন্তানকে আল্লাহর দুশমন কাফির-বেদীন, হিন্দু-ইংরেজদের হাতে পর্যন্ত তুলে দেয়! তাদের স্কুলে ভর্তি করাতে সব কিছু করতে প্রস্তুত হয় এবং ভর্তি করাতে পারলে, মনে করে-আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে, যেন তার মত ভাগ্যবান পিতা আর নেই। নিজের সন্তানের ধ্বংসের সব রকম ব্যবস্থাকে পাকাপোক্তা করার পর তার কল্যাণের আশা রাখা কতটুকু যুক্তিযুক্ত, তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে হিদায়াত দান করুন (আমীন)।

এ জাতীয় নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাচার জন্য সকলের ইলমে দীনের গুরুত্ব, ফজীলত ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা দরকার। তাই এ বিষয়ে জরুরী আলোকপাত করা হচ্ছে।

ইলমে দীনের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইলমে দীনের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ উদ্বৃত্ত হলঃ

(১) কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (المجادلة:٢)

"যারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে বিশ্বাস করবে এবং যাদেরকে দীনী ইলম দেয়া হবে, অর্থাৎ যারা কষ্ট-মুজাহাদা করে ইলমে দীন হাসিল করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।" (সূরাহ মুযাদালা, আয়াত-২)

(২) আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ (الزمر:٩)

"বলোতো যারা ইলমে দীন হাসিল করেছে এবং যারা কুরআনের ইলম হাসিল করেনি, তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে?" অর্থাৎ যারা ইলম হাসিল করেনি এমনকি উলামায়ে কিরামের সাথে যাদের উঠা-বসা বা কোনরূপ যোগাযোগও নেই তাদের জন্য আল্লাহর যথার্থ গোলামী অসম্ভব। তাই গোলাম হয়ে মালিকের গোলামীর খবর না রাখায় তারা পশু স্তরেরও নীচে অবস্থান করে। তারা কখনো ইলম ওয়ালাদের সমান হতে পারে না।" (সুরাহ যুমার, আয়াত-৯)

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "দীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান (নর-নারীর)-এর উপর ফরজে আইন।" অর্থাৎ এ ব্যাপারে অবহেলা করলে আল্লাহর দরবারে কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলবে না। (ইবনে মাজাহ ১/১৩৬)

(৪) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে কুরআনে কারীম শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী শরীফ ২/১২৯৪)

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-"আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে দীনে ইলম দান করেন।" (বুখারী শরীফ ১/৩৯)

(৬) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-"দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছু অভিশপ্ত। তবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী এবং তার জন্য সহযোগী উপকরণ অথবা দীনের আলেম কিংবা দীনের তালিবে ইলম অভিশপ্ত নয়।" (তিরমিযী শরীফ ২৩২৭)

(৭) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-"আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। নবীগণ মীরাস সুত্রে টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা রেখে যাননি, তাঁরা শুধু দীনী ইলম রেখে গিয়েছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলমে দীন হাসিল করেছে, সে অনেক বড় দৌলত হাসিল করেছে।"

এখানে শুধু নমুনা স্বরূপ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞানী লোকদের জন্য শুধু ইশারাই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর মূর্খদের জন্য দলীল প্রমাণের পাহাড়ও বৃথা। সুতরাং এখানে অনেক বেশী হাদীস উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। অন্যথায় এ ব্যাপারে এতবেশী ফজীলত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণীত হয়েছে, যা একত্রিত করলে, মোটা ভলিউমের বৃহৎ কিতাবে পরিণত হবে।

দীনী ইলম শিক্ষা করার ফায়দা

ইলমে দীন শিক্ষা করার কয়েকটি ফায়দা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) ইলমে দীন শিক্ষার মাধ্যমে খালিক মালিক আল্লাহ তা’আলার পরিচয় লাভ হয়, মানুষ যে আল্লাহর দাস এবং গোলাম, তা সম্যকরূপে জানা যায় এবং গোলাম হিসেবে তার কি যিম্মাদারী ও দায়িত্ব কর্তব্য, তা শিখা যায়। আর এরই মাধ্যমে ইহকাল-পরকালের যাবতীয় কল্যাণ হাসিল হয়। পক্ষান্তরে কুরআন সুন্নাহ এর ইলম ব্যতীত দুনিয়াতে যত প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, এর সবগুলো দ্বারা শুধুমাত্র পশু চাহিদা তথা খানাপিনা ও দৈহিক আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা অর্জিত হয়। এর বাইরে মানুষ যে সৃষ্টির সেরা, বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, মৃত্যুর পর তার সামনে স্থায়ী জগত আসছে, সেখানে জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, তারপরে হয় সে স্থায়ী সুখের অধিকারী হরে, নয়তো স্থায়ী ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হবে- এ সব বিষয়ের কোন আলোচনা বা দিক নির্দেশনা দুনিয়াদার ও কাফির মুশরিকদের প্রবর্তিত সেই সকল তথাকথিত শিক্ষার মধ্যে নেই।

মোদ্দাকথা, কুরআন-হাদীস ও দীনের ইলম শিক্ষা দেয় যে, মানুষের দুনিয়াতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঈমান ও আমলকে দুরস্ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। খানা-পিনা, আরাম-আয়েশ দুনিয়ার যিন্দেগীর মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। বেঁচে থাকার জন্য এগুলোর দরকার আছে বটে, কিন্তু তাই বলে যে এটাই তার জীবনের সব কিছু, এমনটি নয়।

(২) দীনী ইলম দ্বারা প্রকৃত ইযযত ও শান্তি অর্জিত হয়। সূরাহ মুনাফিকুনের মধ্যে আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেন- “প্রকৃত ইযযত মুমিনদের জন্য নির্ধারিত।”

সুতরাং ঈমান-আমল ছাড়া বাহ্যিক ও অস্থায়ী ইযযত মিললেও স্থায়ী ও মানুষের অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা হাসিল হয় না। আর ঈমান ও আমল প্রকৃত পক্ষে দীনী ইলম ছাড়া হাসিল করা সম্ভব নয়। চাই সে ইলম মাদ্রাসায় পড়ে শিক্ষা লাভ করুক, বা উলামায়ে কিরামের সাথে উঠা-বসার দ্বারা অর্জন করুক।

তেমনিভাবে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে- “একমাত্র কুরআন অনুযায়ী চলার দ্বারা দিলের প্রশান্তি বা প্রকৃত সুখ হাসিল হয়।” সুতরাং একমাত্র কুরআনের ইলম দ্বারা ঈমান ও আমল দুরস্ত করার মাধ্যমেই সুখ শান্তি হাসিল হওয়া নিহিত। অন্য

আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, “যে সকল নরনারী ঈমান ও আমল দুরস্ত করবে, তাদেরকে হায়াতে তাইয়্যিবা বা মজাদার যিন্দেগী দান করা হবে।”

সুতরাং দীনী ইলম ও আমল ব্যতীত বাহ্যিকভাবে সুখের সামগ্রী জমা করা গেলেও প্রকৃত সুখ-শান্তি ও দিলের আনন্দ তা দ্বারা হাসিল করা সম্ভব নয়। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طه:١٢٤)

“যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার যিন্দেগী তিক্ত ও কষ্টদায়ক করে দেয়া হবে ” (সূরাহ ত্বহা, ১২৪)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা’আলা বলেন-

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (التوبة: ٥٥)

“পাপীদের ধন-জন যেন তোমাদের বিস্মিত না করে। কেননা- আল্লাহ তা’আলা চান যে, ঐগুলোর দ্বারা তাদেরকে দুনিয়াতে আযাবে নিপতিত করেন।” (সূরাহ তওবা, ৫৫)

(৩) দীনী ইলম ও আমল এমন দৌলত- যা সব সময় সঙ্গের সাথী হয়ে থাকে এবং সে ব্যক্তি সমগ্র দুনিয়া থেকে বেনিয়ায (মুখাপেক্ষীহীন) হয়ে যায়। আর তার এমন খুশী ও ইতমিনান (আত্মতৃপ্তি) নসীব হয়, যা কোন রাজা-বাদশাহদেরও নসীব হয় না। তাছাড়া ইলমের কদর আখিরাতে যে কত অত্যাধিক হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে পার্থিব শিক্ষা বা মাল ও দৌলত নেহাত অস্থায়ী। পরকালে তো এগুলোর কোন মূল্যই নেই, এমনকি দুনিয়াতেও মাল-দৌলত যে কোন সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের চাকুরীর বয়স শেষ হওয়ার পরে তার শিক্ষা ডিগ্রী তেমন কোন কাজে আসে না।

(৪) কেউ দীনী ইলম অর্জনরত অবস্থায় মারা গেলেও সে ব্যক্তি কামিয়াব হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র দরবারে সে ব্যক্তি শহীদ গণ্য হয়, আল্লাহ তা’আলা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। পক্ষান্তরে পার্থিব বিদ্যা অধ্যায়নরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে, তার সবই বিফলে গেল। এ অসম্পূর্ণ বিদ্যার কারণে দুনিয়া বা আখিরতে তার কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।

(৫) দীনী ইলমের বদৌলতে একজন নিম্ন খান্দানের সাধারণ মানুষও আম্বিয়া কিরামের উত্তরাধিকারী হওয়ার মহাগৌরব অর্জন করতে পারে এবং নবীওয়ালা মহান দীনী কাজ আনজাম দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে সকল শ্রেণীর মুসলমানদের সরদার হতে পারে। আর পরকালের ভয়াবহ আযাব থেকে বেঁচে সে পরকালীন মহা কল্যাণ লাভে সক্ষম হয়। ইমাম মুহাম্মদ রহ. কে ইন্তিকালের পর জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা’আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

তিনি জওয়াব দিলেন, “কবরে আসার পরে আমাকে বলা হলো যে, তুমি কি চাও? আমি বললাম- হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো- হে মুহাম্মদ! আমার যদি তোমাকে আযাব দেয়ার ইচ্ছা থাকতো! তাহলে তোমাকে দীনী ইলম কেন দান করা হয়েছিল? তোমাকে আমার ইলম এজন্য দেয়া হয়েছিল যে, আমি তোমাকে মাফ করতে চাই।”

অপরদিকে দীনকে বাদ দিয়ে শুধু যে পার্থিব বিদ্যা হাসিল করা হয়, তা ফিরআউন, কারূন, হামানের ন্যায় দুনিয়াদারদের উত্তরাধিকার। এ বিদ্যা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি তথা মুসলমানদের সরদার বানাতে সক্ষম নয়। তবে হ্যাঁ, মুসলমানদের খাদেম হতে পারে। আর এ পার্থিব বিদ্যা আখিরাতের আযাব থেকেও কাউকে বাঁচাতে পারে না।

(৬) দীনী ইলমের দ্বারা ইসলাম কায়েম হয় এবং পৃথিবীতে ইসলাম টিকে থাকে। কারণ কোন বস্তু সে বিষয়ের পারদর্শী লোক ছাড়া চলতে পারে না। সুতরাং যারা ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে বিদ্যমান দেখতে চায় তাদের জন্য দীনী ইলমের মাদ্রাসা কায়িম করা এবং নিজের সন্তানদের সেখানে তালীম দেয়ার ব্যবস্থা করা জরুরী। শুধু পার্থিব বিদ্যার অধিকারীদের দ্বারা কিছুতেই ইসলাম টিকে থাকতে বা কায়িম হতে পারে না। তারা যদি উলামাদের রাহবারী ছাড়া বাহ্যিক ভাবে ইসলামের নামে কোন কিছু কায়িম করেও ফেলে, তাহলে তা কোন ক্রমেই সহীহ ইসলাম হবে না-যার নমুনা তাদের বিভিন্ন গোমরাহ ও ভণ্ড ব্যক্তিদের প্রবর্তিত নকল ইসলাম। তারা নিজেদের বুঝ মত ইসলামের এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছে, যার সাথে প্রকৃত ইসলামের মিল খুব সামান্যই রয়েছে। এক কথায়, সেটাকে মডার্ণ ইসলাম বা ভেজাল পূর্ণ ইসলাম বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটা মদীনার ইসলাম অবশ্যই নয়। আর ঐ ইসলামে বিশ্বাসীদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’ আতের অন্তর্ভূক্ত বলে বিশ্বাস করাও জায়িয হবে না।

(৭) দীনী ইলমের ধারক ও বাহকগণ দুনিয়ার হায়াত তথা পৃথিবীর অস্তিত্বের ধারক। হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে যতদিন দীনী ইলমের একজন চর্চাকারীও দুনিয়ায় থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না বা দুনিয়ার অস্তিত্ব টিকে থাকবে।(বুখারী শরীফ ১/৪১)

বলা বাহুল্য, দুনিয়াদার ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু সমুদয় লোক দুনিয়াতে উন্নতি করার এবং দুনিয়াকে ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে কেবল দীনী ইলমের ধারক বাহকগণের বদৌলতে। পৃথিবীতে যেদিন দীনের চর্চাকারী একজন আলিমও অবশিষ্ট থাকবেন না, তখন আল্লাহ্ তা’আলা দুনিয়াকে লন্ড ভণ্ড করে দিবেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে।

দুনিয়াতে সাধারণ নিয়ম হলো- কোন শহরের অধিকাংশ লোক বিদ্রোহী হলে, সম্পূর্ণ শহরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা’আলা রাহমান, অসীম দয়ালু। তাই

অধিকাংশ মানুষ তার বিদ্রোহী হলেও তিনি দুনিয়াকে ধ্বংস করবেন না। তবে হ্যাঁ, যখন সম্পূর্ণ মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যাবে, একজনও ফরমাবরদার থাকবে না, তখন তিনি দুনিয়া ধ্বংস করে দিবেন। যদিও সেই মুহূর্তে দুনিয়ার প্রত্যেকটা লোক পার্থিব শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী হোন না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সামান্যতম মূল্যায়ন করে এক সেকেন্ডের জন্যও দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখবেন না।

(৮) দীনী ইলমের মধ্যেই মুসলমানদের পার্থিব কল্যাণ নিহিত। মুসলমানদের জন্য অন্য বেদীন কাফির সম্প্রদয়ের অবস্থার সাথে নিজেদের অবস্থা তুলনা করা ঠিক নয়। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ইত্যাদি কাফির সম্প্রদায় গলদ লাইনে বা মাল- দৌলতের লাইনে মেহনত করে দুনিয়াতে উন্নতি হাসিল করতে পারে ঠিক, কিন্তু দুনিয়ার শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের দুনিয়ার উন্নতি ও প্রগতি দীনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন তাদের দীনী হালত উন্নত হয়েছে, তখন তাদের পার্থিব অবস্থারও উন্নতি ঘটেছে। এমন কি রাজত্ব-কর্তৃত্ব তখন তাদের পদ চুম্বন করেছে। আর যখন তাদের নিকট দীনী ইলম না থাকায় দীনী হালাত খারাব হয়েছে, তখন তাদের পার্থিব উন্নতি-প্রগতিও খারাব হয়ে গেছে। এমন কি তাদের দীনী হালতের অধঃপতনের সাথে সাথে শত শত বৎসরের রাজত্ব-কর্তৃত্ব কাফিরদের হাতে চলে গিয়েছে এবং তারা তখন কাফিরদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে ও ব্যাপকভাবে মার খেয়েছে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং তা পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। মুসলিম মিল্লাত কুরআন তা'লীমকে মোল্লাগিরি বা ফকীরি বিদ্যা নাম দিয়ে এটাকে বাদ দিয়ে যখন খৃষ্টান-বিধর্মীদের বিদ্যার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, তখনই তাদের মান-মর্যাদা, ইযযত-সম্মান সবই ভুলুণ্ঠিত হয়ে হিন্দু, ইংরেজ তথা কাফিরদের তোষামোদ প্রিয় ও তাদের গোলামী বা অন্ধ অনুকরণের জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত তাদের এ ভুল না ভাঙ্গবে এবং তারা ইলমের মাধ্যমে ঈমান আমল দুরস্ত না করবে, ততদিন তারা কাফিরদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধই থাকবে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। তাদের মুক্তির একমাত্র পথ দীনী ইলম ও ঈমান আমলের মিহনতের দিকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসা।

(৯) দীনী ইলমের দ্বারা আপামর মানুষদের পার্থিব কল্যাণ লাভের সাথে সাথে পরকালীন প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হয় অর্থাৎ একজন আলেম তার ইলমের দ্বারা মানুষদেরকে দুনিয়াতে কিভাবে তারা সৎভাবে চলবে, কিভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, কিভাবে অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-অবিচার থেকে বেঁচে থাকতে পারবে, কিভাবে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হবে, কিভাবে অন্যের বিপদ-আপদে তার পাশে দাঁড়াবে, কিভাবে অন্যের সার্বিক কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত হবে তা শিক্ষা দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা যে, একজন আলেম পথভোলা মানুষকে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ্র চির সন্তুষ্টি ও জান্নাতের রাস্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

পক্ষান্তরে দুনিয়াদারদের তা'লীম দ্বারা নিজের পেট-পূঁজা ও ভোগ বিলাস ছাড়া অন্যকে সৎ ও নীতিবান বানানোর কোন দিক-নির্দেশনা লাভ হয় না। আর তারা সুনাম বা সুখ্যাতির জন্য তাদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং লাইন দ্বারা সামান্য কিছু পার্থিব কল্যাণ ছাড়া পরকালীন কোন প্রকার কল্যাণ সাধন করতে পারে না বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেদিকে তৎপর হয় না। আর এ কথা স্পষ্ট যে, একটা মানুষকে তার শারীরিক রোগ থেকে মুক্তি দেয়া আর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। নিয়ত ও স্বার্থ সংশ্লিষ্টতায় পার্থক্য তো আছেই।

(১০) দীনী ইলম দ্বারা যে ঈমান ও আমলের পরিবেশ গড়ে উঠে, তথা নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, হালাল রিযিক, ন্যায় নীতি, পিতামাতাসহ সকল মানুষের অধিকার আদায় এবং দিলের থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, বখিলী ইত্যাদি দূর করার শিক্ষা লাভ হয় এবং এর মাধ্যমে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠে, এর দ্বারা মানুষে মানুষে হানাহানী, কাটাকাটি বন্ধ হয়ে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক পয়দা হয়ে দুনিয়াতে জান্নাতী পরিবেশ কায়েম হয়, সুখ-শান্তি, জান-মালের নিরাপত্তা ও ইযযত সম্মান হাসিল হয়। বলাবাহুল্য, নামায দ্বারা আল্লাহর সামনে বার বার নিজের ক্ষুদ্রতা প্রমাণিত করার দ্বারা মানুষ বিনয়ী হয়, তার থেকে অহংকার দূরীভূত হয়। আর এটাই ঐক্যের ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণের ভিত্তি বা বুনিয়াদ। তেমনি ভাবে রোযা দ্বারা পশু স্বভাব ও উগ্রতা, হিংস্রতা কন্ট্রোল হয় এবং অন্যের দুঃখ বেদনা অনুধাবন করে তাদের সমবেদনা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। অনুরূপ যাকাত দ্বারা বখিলী দুর হয় অন্যের প্রতি কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হয়। আর হজ্বের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের অনন্য ইজতিমার দ্বারা বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং একে অন্যের জরুরত ও সমস্যা অবগত হয়ে তার সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। আর হালাল রিযিকের নীতি ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোকা-ফাঁকি, নকল, ভেজালসহ বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার অন্যায় অবিচার ও অনিয়ম তিরোহিত করে। ইসলামের অধিকার আদায় নীতি দ্বারা কোন মুসলমানের দ্বারা অন্য মুসলমানতো দূরের কথা, কোন একজন কাফির-বেদীনও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পথ থাকে না। সুতরাং ইসলামের প্রত্যেক ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের জান্নাত লাভের সাথে সাথে দুনিয়াবী প্রভূত কল্যাণের সমূহ উপকরণ বিদ্যমান। এর দ্বারা সমস্ত জুলুম-শোষণ, ফিৎনা-বিশৃঙ্খলা বন্ধ হয়ে ইনসাফ ও শৃঙ্খলা ভিত্তিক জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ দুনিয়াদারদের বিদ্যার মধ্যে এ সবের নাম মাত্রও নেই। তারা সুনাম বা পদের লোভে দুনিয়াতে জনসাধারণের সাময়িক কিছু কল্যাণ সাধন করলেও যেখানে তার স্বার্থ নেই বা বদনামী ও শাস্তির আশংকা আছে এমন ক্ষেত্রে তারা অন্যের কল্যাণে কিছু করে না। বরং নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন-রূপে অবৈধ কাজ দ্বিধাহীন চিত্তে করে যেতে থাকে।

দীনের ইলম ও দুনিয়ার শিক্ষার মধ্যে উল্লেখিত পর্বত মহাপর্বত ব্যবধান জানা সত্ত্বেও কোন পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানকে বৃহৎ কল্যাণের দীনী ইলম থেকে মাহরূম করে

সামান্য পার্থিব স্বার্থের মোহে পড়ে স্বীয় সন্তানদের অমূল্য আমানতী জীবনকে ধ্বংস করার খিয়ানতী সাহস দেখাতে পারেন না। প্রত্যেক মুসলিম অভিভাবকের এ পথে জবাবদিহীতার সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। ইহকালে যাই হোক না কেন, পরকালে তা অবশ্যম্ভাবী।

সন্তানরা পিতা-মাতার বেহেশত-দোযখের সামান

বাস্তবিক পক্ষে সন্তানকে কুরআন শরীফ এবং ইলম শিক্ষা দেয়া পিতামাতার জন্য সবচেয়ে বড় কামিয়াবী। এ ধরণের পিতা-মাতা অন্য পিতা-মাতার তুলনায় প্রকৃতপক্ষেই ভাগ্যবান। তারাই সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যশালী। দুনিয়ায় আসার পর প্রত্যেকের সামনে তিনটি জগত বিদ্যমান থাকে। যথাঃ আলমে দুনিয়া, আলমে বরযখ (কবরের যিন্দেগী) এবং আলমে আখিরাত। যে সমস্ত পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে কুরআনে কারীম এবং দীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে শুধুমাত্র অস্থায়ী জগতের রুটি-রুজীর জন্য পার্থিব বিষয়াদি শিক্ষা দেয়, তারা সন্তানের দ্বারা শুধুমাত্র দুনিয়াতে যৎকিঞ্চিত উপকৃত হতে পারে। সেটাও নিশ্চিত নয়। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসছে। কিন্তু ঐ সন্তানের দ্বারা তারা কবরের যিন্দেগীতে এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে কোন উপকার পাওয়ার আশা করতে পারে না। বরং সন্তানকে ইলমে দীন শিক্ষা দেয়ার ফরজ দায়িত্ব তরক করার দরুন এবং ইলমে দীন বঞ্চিত সন্তানের সকল অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতির গুনাহে অংশীদার হওয়ার দরুন প্রত্যেক ঘাটিতে সেই পিতামাতা আটকা পড়বে এবং আযাব ও গযবের সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে যারা সন্তানকে দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করবে, তারা দুনিয়াতে, কবরে ও আখিরাতে কামিয়াব হবে। সকল স্থানে সন্তানের উসীলায় সুখ-শান্তি ও আরাম ভোগ করবে। পবিত্র কুরআন-হাদীসের ভাণ্ডারে পিতা-মাতার সম্মান, কদর এবং তারা সন্তানের জন্য কত বড় নিয়ামত-এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে, যা একত্র করলে কয়েক ভলিয়মের একটি রিরাট কিতাব প্রস্তুত হয়ে যাবে। এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে তুলে-ধরা হচ্ছে। এসব আলোচনা পার্থিব শিক্ষার লাইনে না থাকার দরুন ঐ সব লাইন পড়ার পর একটি সন্তান জানতেই পারে না যে, তার পিতামাতা কত বড় নিয়ামত আর তাদের হকই বা কি কি।

পিতামাতার হক সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশনা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان:١٤)

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু-বছরে শেষ হয়েছে। আর আমি নির্দেশ দিতেছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি

কৃতজ্ঞ হও। (মনে রাখবে) অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।” (সূরাহ লুকমান, আয়াত ১৪)

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র ইরশাদ করেন

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤)

“তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্যে উপনীত হন, তবে ধূস্, দুর বা এ ধরনের বিরক্তি প্রকাশ করার কোন শব্দ তাদের ব্যাপারে ব্যবহার করো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। আর তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো- হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা অতি আদর ও মায়া-মহব্বতের দ্বারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।” (সূরাহ বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৩-২৪)

হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তিনবার বললেন- তার নাসিকা ধূলোয় ধূসরিত হোক! সাহাবায়ে কিরাম রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কার ব্যাপারে এসব বদ দু’আ করছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্যে উপনীত অবস্থায় পেল, তবুও সে (তাদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশের পথ সুগম করতে পারল না।” (মুসলিম শরীফ, ২৫৫১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্টি।” (তিরমিযী শরীফ, ১৯০৪)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- কোন বাধ্যগত সন্তান স্বীয় মাতাপিতার দিকে রহমতের (আনুগত্য ও ভক্তির) দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, প্রতি দৃষ্টিতে একটি কবুল হজ্জের ছাওয়াব তার আমলনামায় লিখা হয়। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, সে যদি প্রতিদিন একশতবার দৃষ্টিপাত করে? রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ! তাতে একশত হজ্জের সাওয়াবই হবে। আল্লাহর দান কল্পনাতীত, তিনি অক্ষমতা হতে অতি পবিত্র। (মিশকাত শরীফ- ২/২০৯, বায়হাকী ১০/২৮৯)

হযরত আবু বাকরাহ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা’আলা ইচ্ছে করলে বান্দার সকল প্রকার গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু মাতাপিতার অবাধ্যতার গুনাহ তিনি মাফ করবেন না। আর অবাধ্য সন্তানের সাজা তার মৃত্যুর পূর্বে এই দুনিয়াতেও হবে। (মিশকাত শরীফ ৪২১, বায়হাকী শরীফ)

হযরত আবু উমামাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম- সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন- সন্তানের উপর পিতামাতার কি হক? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন-“পিতামাতা তোমার জান্নাত বা জাহান্নাম। অর্থাৎ তাদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা’আলার সন্তুষ্টি ও জাহান্নাম নিহিত।” (ইবনে মাজাহ, ৩৬৬২)

এসব আলোচনা ইলমে দীনের শিক্ষার্থী, তালিবে ইলমের সামনে থাকার কারণে দুনিয়াতে তারা পিতামাতা উভয়ের অথবা যে কোন একজনের হায়াতে উপস্থিতি সবচেয়ে বড় গণিমত মনে করে থাকে এবং নিজের জানমাল সব কিছু দিয়ে পিতামাতার সেবা-যত্ন করতে চেষ্টা করতে থাকে। তার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি বা কার্পণ্য করে না। নিজের আরাম-আয়েশ নিজের বিবি-বাচ্চার আরাম-আয়েশ সব কিছুর উপর পিতামাতার সেবা-যত্নকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কারণ-সে জানে, কিয়ামতের বড় বড় ১৫টি আলামতের মধ্যে আছে যে, মানুষ বিবিদের কথা মান্য করবে এবং মায়ের নাফরমানী করবে। বন্ধু-বান্ধবকে নিকটবর্তী করবে এবং পিতাকে দূরে রাখবে। (তিরমিযী শরীফ, ২২১৬)

এসব গুনাহে কবীরা আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজ থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা সে ফিকিরমান্দ থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এ ধরণের একজন সন্তান পিতামাতার আত্মার প্রশান্তি এবং নয়নমণি- যা সাধারণ জ্ঞান দ্বারাও বুঝা সম্ভব।

এখন দেখুন, দুনিয়ার যিন্দেগী তো কোন রকম পার হয়ে যাবে, কেউ বালাখানায়, কেউ কুঁড়ে ঘরে, কেউ আরামে, কেউ দুঃখ-কষ্টে, সর্ব অবস্থায়ই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর ইরশাদ মুতাবিক এ উম্মতের অধিকাংশের হায়াত (৬০ থেকে ৭০ বছরের হায়াত) শেষ হয়ে যাবেই। কেউ দুনিয়াতে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না। সে যত বড় রাজা, বাদশাহ আর সম্পদশালী কিংবা বৃহৎ ইজ্জতের অধিকারী হোক না কেন। সকলকেই শেষ অবস্থা অতিক্রম করতে হবে- সকলেরই বিশেষ পরিণতিই এটা যে তাকে সারা জীবনের অর্জিত গাড়ী, বাড়ী, রাজত্ব-কর্তৃত্ব, বাগ-বাগান, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব কিছু রেখে সম্পূর্ণ খালি হাতে পরপারের সফরের প্রথম ষ্টেশন বা ঘাঁটি কবরে পৌঁছতে হবে। মাল-দৌলত, ইযযত-সম্মান, স্ত্রী-পুত্র কেউ সাথী হবে না। দাফনের পর সকলেই বাড়ীতে ফিরে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার কবরে অত্যন্ত ভয়ংকর ও ভয়াবহ আকৃতিতে মুনকার-নকীরের আগমন ঘটবে।

এখানে তার ঈমানের পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। সেই পরীক্ষায় দুনিয়ার কাউকে সহযোগিতা করার জন্য পাবে না। দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকবে। তার অবস্থা স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির অবস্থা কবরে এরূপ হয়, যেরূপ সাগরে ডুবন্ত ব্যক্তি সাহায্য প্রাপ্তির আশায় চিৎকার করতে থাকে এবং চতুর্দিকে হাত-পা মারতে থাকে; যাতে বাঁচার কোন ব্যবস্থা লাভ করতে পারে। (বায়হাকী, ১০/৩০০)

তেমনিভাবে মৃত ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের দু’আর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, মন থেকে আকাঙ্খা করতে থাকে। অতঃপর যখন তাদের পক্ষ থেকে কোন দু’আ, ইস্তিগফার বা দান-খাইরাত তার নিকট পৌঁছে, তখন সেটা তাঁর কাছে সমগ্র দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা আছে, তার চেয়েও উত্তম বলে মনে হয়।

আর তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের দু’আকে আল্লাহ্ তা’আলা পাহাড় সমতুল্য প্রবৃদ্ধি করে মৃত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,’মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের পক্ষ থেকে হাদিয়া হলো- তাদের জন্য ইস্তিগফার করা অর্থাৎ তাদের গুনাহ মাফ করার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করা।” (মিশকাত শরীফ, ১/৪৪০)

উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় সন্তানকে কুরআন ও দীনী ইলম শিক্ষা দেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি কবরের মধ্যে সাগরে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় থাকবেন না, সাহায্যকারী পাবেন। তিনি কখনও একাকিত্ববোধ করবেন না। বরং তার সন্তানদের পক্ষ থেকে সর্বক্ষণ তার নিকট হাদিয়া দু’আ-ইস্তিগফার পৌঁছতে থাকবে। তার সন্তান যখন হাত তুলে আল্লাহর দরবারে আল্লাহর শিখানো দু’আ দ্বারা দু’আ করতে থাকবে, তখন তো সেই মৃত পিতামাতা খুশীতে বাগবাগ হয়ে যাবেন। এমন কি যে মুহূর্তে সন্তান দীনের কাজে লিপ্ত থাকবে, লোকদের কুরআনে কারীম শিক্ষা দিবে, ওয়াজ-নসীহত ও দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে লোকদেরকে দীনের দিকে আহবান করতে থাকবে এবং বাহ্যিক ভাবে পিতামাতার জন্য দু’আ করার অবসর পাবে না, তখনও তার সকল নেক কাজে পিতামাতার সহায়ক এবং অংশীদার হওয়ার কারণে ছাওয়াব পেতে থাকবেন। আর এভাবে তাদের নেকী বাড়তেই থাকবে। এমন কি যদি তাদের কারোর মৃত্যুর সময় গুনাহ বেশী এবং নেকী কম থেকে থাকে তাহলে সন্তানদের পক্ষ থেকে অহরহ দীনের খিদমতের নেকী তাদের আমল নামায় যোগ হওয়ার কারণে ইনশাআল্লাহ তাদের নেকীর পাল্লা গুনাহের পাল্লা থেকে ভারী হয়ে তারা আযাব থেকে মুক্তি লাভ করবেন। এর চেয়ে বড় খুশীর বিষয় আর কি হতে পারে?

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- “মানবের মৃত্যুতে তার আমলের অবসান ঘটে, তিনটি আমল ব্যতীত। এবং সেগুলো হল- সদকায়ে জারিয়া, ইলম- যার দ্বারা

(জগৎ) উপকৃত হয়, নেক সন্তান- যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।" (মুসলিম শরীফ, ১৬৩১)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নেক বান্দার মৃত্যুর পর জান্নাতে তার দরজা বুলন্দ করে দিবেন অর্থাৎ তাকে জান্নাতে উচ্চ সম্মান দান করবেন। অনন্তর সে বলবে- হে প্রভু! কি করে এত বড় দরজা ও সম্মান আমার নসীব হলো? তদুত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন- তোমার জন্য তোমার সন্তানের দু'আ ও ইস্তিগফারের উসীলায় তোমাকে এত বড় মর্তবা দেয়া হয়েছে।" (মুসনাদে আহমদ ২/৫০৯, মিশকাত ২০৬ পৃঃ)

হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. একটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন, উক্ত কবরের মৃতকে আযাবের ফেরেশতাগণ আযাব দিচ্ছেন। প্রয়োজন সেরে ঈসা আ. প্রত্যাবর্তন কালে তিনি ঐ কবরটির নিকট দিয়েই যাচ্ছিলেন। এবার তিনি দেখলেন সেখানে রহমতের ফেরেশতাগণকে, যাদের সাথে রয়েছে জান্নাতী নিয়ামতে পরিপূর্ণ নূরের বহু তশতরী। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। অনন্তর তিনি নামায পড়ে আল্লাহ্‌র নিকট এর কারণ জানার জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার নিকট ওহী প্রেরণ করলেন-হে ঈসা! এই ব্যক্তি ছিল পাপী। তাই মৃত্যুর পর হতে সে আমার আযাবে গ্রেফতার ছিল। সে তার স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় রেখে এসেছিল। অতঃপর সে একটি (পুত্র) সন্তান জন্ম দিল। স্ত্রী তাকে প্রতিপালন করল। ধীরে ধীরে ছেলেটি বড় হল এবং সে তাকে (মক্তবে) উস্তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার কালাম শিক্ষা করার জন্য প্রেরণ করল। মুআল্লিম তাকে পড়ালেন- "বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম।" অতঃপর আমার বান্দাকে ভূগর্ভে আমার অগ্নির শাস্তি প্রদান করতে আমার লজ্জা হল যখন দেখলাম তার সন্তান ভূ-পৃষ্ঠে আমার নামের যিকর করছে। আমার কালাম পাক পাঠ করছে। (তাফসীরে কাবীর, ১১/৭২০)

লক্ষ্য করুন, সন্তানকে কালামে পাক শিক্ষা দেয়ার কারণে পিতা-মাতার কবরের যিন্দেগী কত আরামদায়ক ও সুখের হতে পারে। এত বড় কামিয়াবীর খবর জানার পর কোন মুসলমান কি তার সন্তানকে দীনী ইলম থেকে বঞ্চিত রেখে হতভাগা হতে পারে? আর সেই অবস্থায় তাকে কি কবরের যিন্দেগীর উপর ঈমান রাখে বলে বিশ্বাস করা যায়? এ হচ্ছে- সন্তানকে দীনী ইলম শিক্ষাদানে পিতামাতার মর্তবা। পক্ষান্তরে দীন বর্জিত পার্থিব বিদ্যার মধ্যে এ ধরনের ফজীলতের একটা কথাও কুরআন হাদীসে নেই।

কারণ- তার ভিত্তি তো কুরআন-হাদীসের উপরে নয়, বরং তার ভিত্তি হলো- তীব্র ক্ষুধায় কাতর পেট, প্রবৃত্তি ও যৌনক্ষুধা কোন পন্থায় নিবারণ করা যায়, তার উপর। সেই বিদ্যার সারাংশ হল- শরীরের আরাম-আয়েশের ধান্ধায় চব্বিশ ঘণ্টা মগ্ন থাকা। সে কে? কেন দুনিয়ায় এসেছে? তার গন্তব্যস্থল কোথায়? এসব চিন্তার ধার সেই

বিদ্যা ধারে না। পশু বৃত্তির এ ধরনের জিন্দেগী থেকে আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে হিফাজত নসীব করুন। (আমীন)

বলাবাহুল্য, কোন মুসলমান পরকাল ও আখিরাত থেকে বে-ফিকির থাকতে পারে না। হাশরের ময়দান কত কঠিন বিষয়। সেই দিনের ভয়াবহতা এবং ভয়ঙ্করতা কত মারাত্মক এবং সেই দিনটার প্রতিটি মুহূর্ত কত বিভীষিকাময় হবে, তা কল্পনাও করা যায় না। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, সেই দিনটি পঞ্চাশ হাজার বছর লম্বা হবে। সেই দিনে সূর্য মানুষের মাথার একেবারে কাছে থাকবে। গুনাহগাররা গুনাহ অনুযায়ী শরীরের ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। গুনাহের পরিণামে বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে। পিপাসায় কাতর থাকবে। আমলনামা ডান হাতে আসবে, না বাম হাতে আসবে, সে ব্যাপারে চরম শঙ্কিত থাকবে। মীযানের নেকী-বদীর চিন্তায় ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে এবং পুলসিরাত পার হওয়ার দুশ্চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়বে। আম্বিয়া আ. গণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কথা বলার সাহস করবেন না। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন কেউ কারোর পরিচয় দিবে না। কেউ কারো খোঁজ-খবরও নিবে না। সকলেই নিজের পেরেশানীতে পাগল পারা হয়ে ঘুরতে থাকবে। সেই দিনের অবস্থা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন এভাবে অংকিত করেছেনঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)

"সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা থেকে, তার পিতামাতা থেকে! তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। সে দিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে- যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।" (সূরাহ আবাসা-৩৪-৩৭)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (٢)

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। সেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। আর মানুষদের তুমি দেখবে মাতাল, অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আযাব বড়ই কঠিন।" (সূরাহ হাজ্ঃ ১-২)

এই কঠিনতম দিনে পিতা-মাতা কলিজার টুকরা সন্তানের সুফল ভোগ করবে, যদি তারা সন্তানকে কুরআনের তালীম দিয়ে থাকেন।

এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- হযরত মুআয জুহানী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে তদনুযায়ী আমল করল, (কুরআনী যিন্দেগী

অবলম্বন করল) কিয়ামত দিবসে তার মাতাপিতাকে একটি (করে) নূরের মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে। সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে থাকলে যে আলো হত, তার চেয়েও অধিক উত্তম (উজ্জ্বল) হবে সেই মুকুটের জ্যোতি। তাহলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কুরআনের উপর স্বয়ং আমল করবে?" (আবু দাউদ ২/৯৭)

হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল ও মুখস্থ করল এবং তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জেনে তদনুযায়ী আমল করল, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।" (তিরমিযী শরীফ ২৯১০)

হযরত আনাস রাযি. হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে এতটুকু ইলম (হলেও) শিক্ষা দিবে, যেন সে দেখে দেখে কুরআন শরীফ পড়তে পারে, তার পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে সন্তানকে পবিত্র কুরআন হিফয করাবে, তাকে কিয়ামতের দিন পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় করে উঠান হবে এবং তার পুত্রকে বলা হবে- পড়। যখন সে একটি আয়াত পড়বে, তখন পুত্রের দরজা বুলন্দ হওয়ার সাথে সাথে তার পিতামাতারও একটি দরজা বুলন্দ করা হবে। এভাবে পূর্ণ কুরআন খতম করা হবে। (তাবারানী শরীফ ১/৫২৪)

উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, সন্তান-সন্তানাদি পিতামাতার জন্য যবরদস্ত নিয়ামত, যা তার দুনিয়া, কবর ও আখিরাতের সকল ঘাঁটিতে কাজে আসবে যদি তারা সন্তানদের কুরআনে কারীমের তা'লীম দিয়ে থাকে। নতুবা এ সন্তান প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য সমূহ বিপদের ও আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ- তারা আল্লাহ্ তা'আলার এ মহা দৌলত ও নিয়ামতের কদর করেনি। বরং নাশুকরী করেছে। তাই এর দরুন তারা কঠোর শাস্তিতে ভুগবে। সুতরাং প্রত্যেকেরই এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য ও জরুরী। দীনের ইলম না থাকার দরুন অসংখ্য পিতামাতা নিজেদের ও সন্তানের কল্যাণ-কামনায় ভুল পদ্ধতিতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু বস্তুতঃ এর দ্বারা কেউ প্রকৃত কল্যাণ হাসিল করতে পারছে না। তাই সময় ও সুযোগ থাকতে এ নিয়ামতের সৎ ব্যবহার করা কর্তব্য।

আগে দীনী ইলম শিক্ষা তারপর পার্থিব শিক্ষা

সন্তানকে ফরজে আইন পরিমাণ দীনী তালীম দেয়ার পর দুনিয়া হাসিল করার জন্য কেউ যদি পার্থিব বিষয় শিক্ষা দেয় তাহলে এটা শরী' আতের দৃষ্টিতে নিষেধ নয়। বরং সম্পূর্ণ জায়িয। কিন্তু আফসোস, বর্তমানে ফরজে আইন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রেখে সন্তানদের পার্থিব যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে আর তার পরিণতিতে পিতামাতা ও সন্তান উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক সন্তান বেদীন-নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে; আর দীনের ব্যাপারে এদের অজ্ঞতা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের বিপর্যয়ের কারণও হয়ে দাঁড়াচ্ছে সহীহ ইলম না থাকায় আল্লাহ ও রাসূল যে সব বস্তুকে মুসলমানদের

ধ্বংসের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোকেই তাড়া উন্নতি ও প্রগতির আশায় একের পর এক গ্রহণ করে চলছে।

ফলে নেমে আসছে ধ্বংস-বিপর্যয়। যেমন, ইংরেজ তথা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের অনুকরণকে হাদীসের ভাষায় ধ্বংসের এক নম্বর কারণ বলা হয়েছে। অথচ দীনী ইলম না থাকায় পার্থিব বিদ্যা শিক্ষা করার সাথে সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থিব লাইনের শিক্ষার্থীরা নকলভাবে হলেও ইংরেজ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ইংরেজদের চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতি, বেশ-ভূষাকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করছে এবং ইংরেজদের তোষামোদ ও অনুকরণের মধ্যেই কল্যাণ খুঁজছে। আর তাদের নিজস্ব ধর্মকে তারা সেকেলে মনে করছে। আর পিতামাতাকে সেই ধর্মের আচরণে অভ্যস্ত দেখলে তাদেরকে বেওকুফ প্রতিক্রিয়াশীল ভাবছে এবং সেই ধর্ম ও ধর্মের অনুসারী উলামা ও দীনদার ব্যক্তিবর্গকে মৌলবাদী ও অবুঝ মনে করে নিজেকেই নিজে নির্বোধ ও বেকুব প্রমাণিত করছে। পবিত্র কুরআন ও শরী' আত নিয়ে উপহাস করছে। এমনকি যারা ইসলাম বরদাশত করে না, অনেকে তাদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলামের প্রথম কাতারের দুশমনদের দলভুক্ত হয়ে ধ্বংস হচ্ছে। (নাউযুবিল্লাহ)

ইলম বাদ দিয়ে পার্থিব শিক্ষা জায়িয নয়

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٦) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (٧)

"আল্লাহ্ তা'আলা তার ওয়াদা খেলাফ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা শুধু পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটা জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।" (সূরাহ রুম, ৬-৭)

উক্ত আয়াতের সারবস্তু হলো- পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং চরম নির্বুদ্ধিতা। বর্ণিত আয়াতে যারা শুধু দুনিয়াদার ও ইংরেজদের শিক্ষায় শিক্ষিত, যারা দীন ধর্ম সম্পর্কে কোন ইলম রাখেনা, দীনের ইলমের কোন পরওয়াও করে না- এমন লোকদের ব্যাপারে এ কথা বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবনের একটা সাইড তাদের নখদর্পনে কেবল। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, বীজ কখন বপন করবে, শষ্য কখন কাটবে, দালান-কোঠা, বিল্ডিং কিভাবে নির্মাণ করবে, বিলাস-বাসনের উপকরণ কিভাবে আহরণ করবে- এ বিষয়ে তারা সম্যক অবগত, কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর মূল ও প্রধান পিঠ তথা দীন সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিতরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ এ পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা; অর্থাৎ এক কথায় প্রকাশ করা যায় যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ প্রকৃতপক্ষে এখানের বাসিন্দা নয়, বরং পরকালের বাসিন্দা,

এখানে কিছু দিনের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে বেহেশ্‌তে সুখে কালাতিপাত করার জন্য এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে।

বলা বাহুল্য, এই সামগ্রী হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। কুরআন পাকে বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশীল ও ভোগ-বিলাসী জাতি সমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতি দুনিয়াতে সবার সামনে স্পষ্ট। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো তাদের ভাগ্য লিপিতে বন্টিত হয়েছে। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। চরম পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ জমা করতে পারে এবং ভোগ বিলাসের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী জোগাড় করতে সক্ষম হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়- যদিও সে দীন-ধর্ম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। শরী' আতের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টিতে একমাত্র বুদ্ধিমান তারাই, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা, নবী-রাসূল, পরকাল এবং জান্নাত-জাহান্নামের ব্যাপারে ঈমান রাখে; এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আর দুনিয়ার চীজ ও আসবাবকে প্রয়োজন পর্যন্ত সীমিত রাখে; এগুলোকে কখনো জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানায় না। উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যারা দীনী ইলম থেকে বঞ্চিত- যারা কোন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলম হাসিল করেনি বা খানকায় গিয়ে কিংবা দাওয়াতের লাইনে যেয়ে অথবা অন্য কোনভাবে হক্কানী উলামা ও বুজুর্গগণের সাথে সম্পর্ক রেখে সহীহ ইলম হাসিল করেনি, তারা জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান নয়। যদিও তারা তাদের ন্যায় দুনিয়াদার ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বড় বড় সনদ প্রাপ্ত হোক না কেন বা যদিও তাদেরকে মূর্খ লোকেরা মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবী মনে করুক না কেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ৬-৭২২)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

(الانعام: ١٢٣)

"যে ব্যক্তি ছিল মৃত, তাকে আমি জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের- মধ্যে চলাফেরা করে। সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে, সেখান থেকে বের হতে পারছে না?" (সূরাহ আনআম, ১২৩)

উল্লেখিত আয়াতে ঈমান-ইসলাম, ইলম-আমলকে নূর বা আলো বলা হয়েছে, আর কুফর-শিরক ও মূর্খতা-বদদ্বীনীকে জুলমাত বা অন্ধকার বলা হয়েছে। এ দৃষ্টান্তটি পুরোপুরি বাস্তব সম্মত। কারণ- আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা। যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং উপকারী বস্তুসমূহ হাসিল করার সুযোগ পাওয়া যায়। ঈমান ও দীনী ইলম এমন একটি নূর, যার আলো

সমগ্র জমীন, আসমান ও এতদুভয়ের বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত হয়। একমাত্র এ আলোই দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে। যার কাছে এ নূর থাকে, সে-ই ইহকাল ও পরকালের ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, উপকারী বস্তুসমূহ হাসিল করতে পারে এবং উভয় ব্যাপারে অপরকেও পথ প্রদর্শন করে সাহায্য করেতে পারে।

পক্ষান্তরে যার কাছে ঈমান ও ইলমের আলো নেই। দুনিয়ার লাইনে সে ব্যক্তি যতবড় ডিগ্রীধারী হোক না কেন, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। তার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে ইহকাল ও পরকালের উপকারী ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে সে অজ্ঞ। সুতরাং সে নিজে উপকারী ও অপকারী বস্তুসমূহ বাছাই করতে পারে না এবং অপরকেও এ ব্যাপারে কোনরূপ সহযোগিতা করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহ আলো না থাকায় অনুমান করে কিছুটা চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের বস্তু। তাই কাফির ও ইলমবিহীন মানুষেরা এ ক্ষণস্থায়ী জীবন এবং এর লাভ-লোকসান কিছুটা চিনে নেয়। এমন একজন ইলমবিহীন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চোখটাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর মধ্যে কতগুলো অংশ আছে, এর মধ্যে কি কি রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তার চিকিৎসা কি এসব ব্যাপারে কিছু ধারণা রাখলেও সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে এ চক্ষু কেন দিয়েছেন? এ চক্ষুকে কিভাবে ব্যবহার করলে একজন মানুষ বেহেশতী হতে পারে এবং কিভাবে ব্যবহার করলে সে নিশ্চিত জাহান্নামী হবে, এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। এ ব্যাপারে সে ব্যক্তি একেবারেই অজ্ঞ। মোদ্দাকথা, ইলমবিহীন মানুষেরা আলোর অভাবে ইহকালের বিষয়সমূহকে ধারণা ও অনুমান করে কিছুটা বুঝতে সক্ষম হলেও, পরকালীন জীবনের কোন খবরই রাখে না এবং সে জীবনের লাভ-লোকসানের কোন অনুভূতিও তার নেই।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে-মুমিন ঈমানের আলো নিয়ে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। এ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, ঈমান ও কুরআনের ইলমের নুর মসজিদ, মাদ্রাসা বা খানকাহ হুজুরার মধ্যে সীমাবদ্ধ-থাকে না। যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে এ নূর নিয়ে নতুন সমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এ দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌঁছায়। আলো কখনো অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপও অন্ধকারের নিকট নতি স্বীকার করে না। তবে প্রদীপের আলো অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে না। কিন্তু আলোর কিরণ প্রখর হলে, অনেক দূর পর্যন্ত সে আলো পৌঁছে যায়। অবশ্য আলো সর্বাবস্থায়ই অন্ধকারকে ভেদ করে, অন্ধকার তাকে পরাভূত করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে পরাভূত করে সেটি আলোই নয়। তেমনিভাবে মুমিন ব্যক্তি কাফিরের নিকট নতি স্বীকার করতেই পারে না। যদি করে, তাহলে সে আর মুমিন উপাধি পাওয়ার যোগ্য নয়।

উল্লেখিত বর্ণনার দ্বারা বুঝা গেল- মুমিন ও ইলমওয়ালা তার নুর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং তার ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তার নূর দ্বারা অন্য লোকেরাও উপকৃত হতে থাকে। যেমন, আলোর মালিক যদিও নিজের জরুরতে আলো নিয়ে বের হয়, অন্যের উপকার সাধন তার উদ্দেশ্য থাকে না এবং অন্য ব্যক্তিরাও তার আলো থেকে উপকৃত হওয়ার ইরাদা নিয়ে বের হয় না, তথাপিও তার আলো দ্বারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় স্বাভাবিকভাবে সবাই কিছু না কিছু উপকার লাভ করে। পক্ষান্তরে ইলমবিহীন কাফির নিজেও যথাযথ উপকৃত হতে পারে না, আর তার দ্বারা অন্যদের প্রকৃত উপকার ও কল্যাণের তো কোন সম্ভাবনাই নেই।

বর্ণিত আয়াতের সার কথা হলো, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে-দুনিয়া ও আখিরাত সামনে রেখে কুরআনের আলোকে সকল আমলের পরিণাম চিন্তা করা এবং এটা নির্ধারণ করা যে, সাময়িক দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু ক্ষতিকর। অতঃপর উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তু সমূহ থেকে বেঁচে থাকা। অপরকেও এসব উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহবান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া। যাতে করে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়।

যখন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌঁছাতে হবে, তখন কুরআনের এ দৃষ্টান্ত অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠে যে ঐ ব্যক্তিই জীবিত, যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ইলমে দীন অর্জন করে। আর আল্লাহ্ তা’আলার নির্দেশ সমূহ তাঁর রাসূলের তরীকা মুতাবিক পালন করে। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি মৃত, যে ঈমান-ইসলাম, ইলম-আমল থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং দুনিয়াকে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে তার জন্য নিজের মূল্যবান যিন্দেগীকে মাটি করেছে।

স্মর্তব্য যে, নিছক মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিজ্ঞান সায়েন্সের রিসার্চ দ্বারা কোন মানুষকে জীবিত হওয়ার সনদ প্রদান করা যায় না। তার নিকট সৃষ্টিকর্তার পরিচয়, তার নিজের পরিচয়, তার জীবনে লক্ষ্য, তার পরিণাম ও পরবর্তী জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে ইলম না থাকায় সে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে যিন্দা হলেও কুরআনের পরিভাষায় সে মৃত। সে না নিজের উপকার করতে পারে, না অন্যের উপকার করতে পারে। বর্ণিত আয়াতে কাফির ও মুমিনের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে, মুমিন ও কাফিরের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তিক্ত হলেও সত্য যে, বর্তমান দীন বিমুখ ইংরেজদের পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের অবস্থা আয়াতে বর্ণিত কাফিদের অবস্থার অনুরূপ। তাদের নিকট কুরআনের ইলমের আলো না থাকায় তারা জায়িয-নাজায়িয, ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে অক্ষম এবং নিজের ও অন্যের সঠিক কল্যাণ সাধনেও অক্ষম। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৩/৪৩৬)

দীন না শিখে পার্থিব বিদ্যা অর্জনের অশুভ পরিণতি

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى (٢٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (٣٠)

"যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাদেরকে নারী বাচক নাম দিয়ে থাকে। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়। অতএব, যে আমার স্মরণ বিমুখ হয় এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে, তার দিক থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই।" (সূরাহ নাজম-৩০)

উল্লেখিত আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলা হচ্ছে যে, আপনি ঐ সমস্ত লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যারা আমার স্বরণ থেকে বিমুখ এবং একমাত্র পার্থিব জীবনই কামনা করে। ফলতঃ তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৌড় পার্থিব জীবন পর্যন্তই। কুরআনে কারীম পরকালে ও আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফিরদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে। পরিতাপের বিষয়, কুরআনী ইলমের সাথে সম্পর্কহীন ইংরেজদের শিক্ষা এবং পার্থিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদেরকেও সেই পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজকাল ইংরেজদের প্রভাবে অধিকাংশ মুসলমানদের সকল জ্ঞান গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাসকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও তারা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করে না। মুসলমানগণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম উচ্চারণ করে এবং তার সুপারিশ আশা করে, কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে এহেন দূরাবস্থাগ্রস্ত মুসলমানদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ দিচ্ছেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ৮/২১১)

উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, যারা দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শুধু দুনিয়াবী ফিকিরে মশগুল থাকে, তারা হাশরের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা' আত থেকে বঞ্চিত থাকবে। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে দৃষ্টিপাতও করবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তির সীনার মধ্যে কুরআনের কিছু পরিমাণ ইলমও নেই, সে ব্যক্তি পতিত বাড়ীর ন্যায়।" (মুসনাদে আহমদ ১/২২৩)

উক্ত হাদীসের মর্ম হলো-প্রত্যেক মুসলমানের সীনা বা কলবের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ রাখা সম্ভব না হলেও কমপক্ষে কুরআনে কারীমের কিছু অংশ (যার দ্বারা তার সহীহভাবে নামায পড়া সম্ভব হয়) সহীহ ভাবে তিলাওয়াত শিক্ষা করা জরুরী এবং

দৈনন্দিন যিন্দেগীতে চলার জন্য যতটুকু ইলমের প্রয়োজন, বড় আলেম না হতে পারলেও কমপক্ষে ফরজে আইন পরিমাণ ইলমে দীন শিক্ষা করা জরুরী। এ দায়িত্ব যে ব্যক্তি পালন করেনি, তার তুলনা করা হয়েছে পতিত ও অনাবাদ বাড়ীর সাথে। পতিত বাড়ীতে সাধারণতঃ জ্বিন-ভূত, ইঁদুর-বাঁদুর, শিয়াল-কুকুর ইত্যাদি বসবাস করে এবং সেই ঘর আস্তে আস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ঐ ঘর দ্বারা দুনিয়ার মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। তেমনি ভাবে যে ব্যক্তির দিলের মধ্যে কুরআনের ইলম নেই, তার কাছে দুনিয়ার যত ডিগ্রী থাকুক না কেন, তার দিল পতিত বাড়ীর ন্যায়, নফস ও শয়তানের বাসায় পরিণত হবে। সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী ও গুনাহের মধ্যে মজা পায় এবং তার মধ্যেই ডুবে থাকে। কোন ইবাদত বন্দেগী করতেও চায় না। কখনও অপারগ হয়ে মসজিদে বা কোন নেক মজলিসে হাজির হলে কয়েদীর ন্যায় অবস্থান করে। সেগুলোতে তার মন লাগে না। সেখানে কোন রূপসজ্জা বা আনন্দ পায় না। তার দিল বরবাদ হওয়ার কারণে তার হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ, মন-মস্তিষ্ক দ্বারা শুধু গুনাহ ও বদ আমল প্রকাশ পেতে থাকে। এভাবে আস্তে আস্তে তার দিল ও দেমাগ বরবাদ হয়ে সে ব্যক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তার দ্বারা জগতের মানুষের কোন কল্যাণের আশা করা যায় না। সে শুধু নিজের ভোগ-বিলাস, আমোদ-ফুর্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কখনও যদি অন্যের কল্যাণে কিছু করে, তাহলে সেখানেও তার উদ্দেশ্য থাকে এভাবে সুনাম-সুখ্যাতি হাসিল করে তার মাধ্যমে কোন বড় পদ বা কর্তৃত্ব অর্জন করা। যাতে করে ভোগ বিলাসের পথ আরো প্রশস্ত করা যায়। অন্যথায় আখিরাতের নাজাত ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ এবং সেই উদ্দেশ্যে দুঃস্থ মানবতার সেবা তার চিন্তা ধারারও একদম বাইরে।

সন্তানকে ইলমে দীন শিক্ষা না দেয়ার ক্ষতি

প্রত্যেক পিতা-মাতার উপর নিজ সন্তানকে ইলমে দীন শিক্ষা দেয়া ফরজ। যাতে করে সন্তান পিতা-মাতার স্বীয় ঈমান ও আমল-আখলাক রপ্ত করার পাশাপাশি জীবন হায়াতে তাদের খিদমতের হক আদায় করতে সক্ষম হয় এবং তার ইন্তিকালের পর তাদের জানাযার নামায পড়িয়ে বিগলিত অন্তরে মহান আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি করে তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে পারে; তাদের কাফন-দাফন সবকিছু সঠিকভাবে সুন্নত মুতাবিক করতে পারে এবং কবরে-হাশরে নেক সন্তান পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে তাদের নাজাতের উসিলা হতে পারে।

পক্ষান্তরে পিতা-মাতা যদি তাদের এ ফরজ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা অনুযায়ী এটা সন্তানকে হত্যা করার সমতুল্য অপরাধ-এবং এটা সন্তানের প্রতি স্পষ্ট জুলুম এবং তার হক ও অধিকার আদায়ে চরম ব্যর্থতা হয়, যার খেসারতে পিতা-মাতা দুনিয়া ও আখিরাতে পদে পদে বিপদ ও আজাবের সম্মুখীন হবে। দুনিয়াতে নিজেদের দীন-ধর্ম দুর্বল হতে হতে শেষ পর্যন্ত বেদীন হয়ে যেতে পারে এবং সন্তানের বদ দীনী আমলের কারণে কবরে-হাশরে লা' নত ও আজাবের

পাত্র সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাজত করুন। সন্তানকে ইলমে দীন শিক্ষা না দেয়ার দুনিয়াবী ও পরকালীন ক্ষতি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হচ্ছেঃ

দুনিয়াবী ক্ষতিঃ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ----(الأنعام:١٥١)

"তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে যাচ্ছি।" (সূরাহ আনআম-১৫১)

উক্ত আয়াতের সারমর্ম হলোঃ সন্তানকে দীনী শিক্ষা ও উত্তম চরিত্র গঠন থেকে মাহরূম করা এবং তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া সন্তানকে হত্যা করার শামিল। উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত সন্তানকে হত্যা যে গুরুতর অপরাধ ও কঠোর গুনাহ, তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই, যেমন- আইয়ামে জাহেলিয়াতে সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া হতো এবং বর্তমানে উন্নত বিশ্বে সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গড়ার লক্ষ্যে ফ্যামিলি প্লানিং-এর নামে নানাভাবে সন্তানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, তেমনিভাবে সন্তানকে চারিত্রিকভাবে হত্যা করার ব্যাপারটিও এ আয়াতের ব্যাপকতার মধ্যে শামিল। অর্থাৎ সন্তানকে দীনী ও কুরআন শিক্ষা-দীক্ষা না দেয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা। যদ্দরুন আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের ব্যাপারে সে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে- এটাও সন্তানকে হত্যার চাইতেও গুরুতর। বাহ্যিক হত্যার দ্বারা পিতা এক দোষী সাব্যস্ত হয়, কিন্তু চারিত্রিক হত্যার দ্বারা পিতা-পুত্র উভয়ই দোষী হয় এবং উভয়ের উভয় জগত ধ্বংস হয়। বর্তমানে যারা সন্তানকে দীনী শিক্ষা দিচ্ছে না, বরং তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিচ্ছেন, কিংবা দুচারটা পয়সার লোভে এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন-যার ফলে তাদের ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সহীহ আক্বীদা- বিশ্বাসের তা'লীম না দেয়ার তারা নাস্তিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বরং অনেক সন্তান বাহ্যিকভাবে মুসলমান দাবী করলেও বাস্তবে ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে গিয়ে জাতীয় বোধ হারিয়ে চারটা পয়সার বিনিময়ে কাফির-খৃষ্টানদের সহযোগী হয়ে দেশ, ইসলাম ও মুসলমানিত্ব ধ্বংসের পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে- এ ধরনের ভ্রান্তির শিক্ষাদাতা পিতা-মাতা নিঃসন্দেহে সন্তানকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী। তাদের মনে রাখতে হবে, বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু চারিত্রিক হত্যা সন্তানের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। সন্তান হত্যার এ অপরাধের কারণে পিতা-মাতা জালিম ও সন্তান মজলুম সাব্যস্ত হয় এবং এ পরিণতিতে আজীবন পিতা-মাতাকে সন্তানের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হতে হয়। অর্থাৎ সন্তানের হক আদায় না করায় সন্তান জালিম হয়ে যায়, আর পিতা-মাতা নির্যাতিত মজলুম হয়ে জীবন কাটায়। সন্তানের সেবা পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত

হয়। এ সম্পর্কে হাদিসে একটি ঘটনা পাওয়া যায়ঃ হযরত উমর ফারুক রাযি. তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। তাঁর আদালতে এক মজলূম পিতা জালিম সন্তানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো। খলিফা সন্তানকে তলব করে এর কৈফিয়ত চাইলেন। উত্তরে সন্তান জিজ্ঞাসা করলো, হে আমীরুল মুমিনীন! সন্তানের নিকট কি শুধু পিতারই পাওনা বা অধিকার আছে, নাকি পিতার নিকট সন্তানেরও কোন পাওনা আছে? খলীফা জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ, সন্তানেরও পিতার নিকট পাওনা আছে, যথা-সন্তানের খাতিরে অর্থাৎ সন্তানকে আল্লাহ ওয়ালা বানানোর জন্য পিতার কর্তব্য-দীনদার স্বামীভক্ত কোন রমণীকে বিবাহ করা এবং সন্তান জন্ম নেয়ার পর তার জন্য উত্তম নাম রাখা- যাতে তার চরিত্র সুন্দর হয়। কেননা, নামের তাছির ব্যক্তির উপর পরিস্ফুট হয়ে থাকে। তারপর সন্তান পড়ার বয়সে পৌঁছলে, তাকে দীনী তালীম দেয়া। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তারপর যখন সন্তান প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে, তখন তাকে দীনদার পাত্র-পাত্রীর সাথে বিবাহ দেয়া। বালেগ হওয়ার পর পিতা-মাতা সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা না করলে, তার চোখ, কান, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা যত প্রকার গুনাহ সংগঠিত হবে, তা সমানভাবে পিতা-মাতার উপরেও বর্তাবে। পিতার নিকট সন্তানের এ অধিকারগুলো জানার পর ঐ জালিম সন্তান বলতে লাগলো- হে আমীরুল মুমিনীন! আমার পিতা তো এর কোন একটি অধিকারও আদায় করেননি। প্রথমতঃ তিনি আমার খাতিরে দীনদার কোন মহিলাকে বিবাহ করেননি। বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে একটা বেপর্দা চরিত্রহীনা মহিলাকে তিনি বিবাহ করেছেন। তারপর যখন আমি জন্ম নিয়েছি, আমার নাম রেখেছেন জু' উল অর্থাৎ পায়খানার কিড়া। এরপরে যখন আমার বয়স হয়েছে, তখন আমাকে কোনরূপ দীনী তা'লীম না দিয়ে আমাকে কাম-কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। ছেলের এ বক্তব্য যাচাই করে এর সত্যতা উপলব্ধি করে খলীফা এ মামলা খারিজ করে দিলেন এবং পিতাকে বলে দিলেন-তুমিই প্রথমে নিজের সন্তানের উপর জুলুম করেছো, এর ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে।"
(হযরত থানবী রহ. রচিত তরবিয়তে আওলাদ-১১৯ পৃষ্ঠা)

এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, জুলুমের পরিণাম সারা জীবন জুলুম ভোগ করা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যারা সন্তানকে দুনিয়ার লোভে দীনী তা'লীম থেকে মাহরূম করছে, তারা দুনিয়া-আখিরাতের কোথাও এ সন্তান দ্বারা লাভবান হতে পারবে না। উভয় জগতে সন্তান তার জন্য মুসীবতের কারণ হবে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনে, "যখন ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা বাড়বে, তখন কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ প্রকাশ পাবে। তম্মধ্যে একটি এই যে, দীনী শিক্ষা বিমুখ সন্তানেরা স্ত্রীর আনুগত্য করবে, আর মায়ের নাফরমানী করবে। অপর দিকে তারা বন্ধু-বান্ধবের খুবই খাতির-তোয়াজ করবে, কিন্তু পিতার কোন খোঁজ-খবর নিবে না।" (তিরমিযী শরীফ ২২১৬)

অধুনা অনেক দীনদার পিতা-মাতাকে দেখা যাচ্ছে- তারা তাদের ছেলেমেয়েকে দীনী শিক্ষা দিতে নারাজ। পিতা-মাতা খুবই দীনদার। হাজী সাহেব, তাহাজ্জুদ গুজার ইত্যাদি। কিন্তু ছেলে-মেয়েকে আল্লাহওয়ালা বানানোর কোন ফিকির তাদের নেই। তারা সন্তানদেরকে নির্দ্বিধায় ইংরেজদের হাতে বা ইংরেজদের সিলেবাসে শিক্ষা লাভ করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে রেখেছেন। না তাকে ঈমান আমলের কোন তা'লীম দিচ্ছেন, না তাকে নাফরমানী থেকে বাঁচানোর জন্য কোনরূপ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এর পরিণতি এই হচ্ছে যে, ছেলে-মেয়ের বদ দীনীর কারণে পিতা-মাতার দীনদারী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আস্তে আস্তে তাদের দীনদারী সুনাম নষ্ট হয়ে বদনাম শুরু হবেই। সন্তানের কারণেই তার ঘরে টেলিভিশন, ভিসিআর ঢুকবে। ছেলের রূপসী বদ্দীন স্ত্রীর কারণে দীনদারী পরিবেশ নষ্ট হতে থাকবে। সম্পূর্ণ ঘরটা নাচগানের একটা আসর হয়ে যাবে। অনেক লোকের একটা আসর হয়ে যাবে। অনেক লোককে দেখা গেছে- বউয়ের বদদ্বীনী আচরণের কারণে ঘরে বসে ২/৪ রাকা' আত নফল নামায পড়ার মত সুযোগও তাদের নেই। অথচ এই ঘর বহু কষ্টের বিনিময়ে তিনিই তৈরি করেছেন। কিন্তু আজ তিনি সেখান থেকে বিতাড়িত। অথবা ছেলে-মেয়েদের এসব নাফরমানী নীরবে তাকে সহ্য করতে হচ্ছে। এগুলোকে মনে না চাইলেও তখন তার মেনে নিয়ে "বোবা শয়তানের" উপাধির পাত্র হচ্ছেন।

অন্যায়ের সমর্থন অন্যায়, আর শেষ পর্যন্ত তা অন্যায়েই লিপ্ত করে। অন্যায়ের পরিণতিতে এবং সন্তানের প্রতি মহব্বতের কারণে শেষ পর্যন্ত অনেক পিতা-মাতাও নিজেদের দীনদারীকে বাদ দিয়ে জান্নাতের আয়েশ-আরামের কথা ভুলে গিয়ে সন্তান কর্তৃক আমদানিকৃত গুনাহের আসরে শরীক হয়ে দুনিয়াবী হারাম আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠেন। (আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাজত করেন।)

সন্তানের বদদীনীর কারণে পিতা-মাতার দীনদারী নষ্ট হতে পারে, এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা আ. ও খিজির আ.-এর ঘটনার এক স্থানে ইরশাদ করেন,

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (الكهف: ٧٤)

"অতঃপর মূসা ও খিজির আ. চলতে লাগলেন। অবশেষে একটি বালককে দেখতে পেলেন। তখন খিজির আ. উক্ত বালকটিকে হত্যা করলেন। মুসা আ. বললেন- আপনি একটা নিষ্পাপ জীবনকে বিনা কারণে হত্যা করলেন?" (সুরাহ কাহাফ-৭৪)

অতঃপর উভয়ের বিচ্ছিন্নতার মুহূর্তে হযরত খিজির আ. পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী তার প্রত্যেকটি আশ্চর্যজনক কাজের ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। তখন বালক হত্যার কারণ উল্লেখ করলেন এই যে, তার পিতা-মাতা ছিলো ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা "তার পিতা-মাতাকে প্রভাবিত করবে।

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (الكهف:٨٠)

সুতরাং তার পিতা-মাতার ঈমানের হিফাজতের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশে আমি বালকটিকে হত্যা করেছি" (সুরাহ কাহাফ-৮০)

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে উক্ত কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, হযরত খিযির আ. বালকটির হত্যার কারণ বর্ণনা করলেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফর ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল, তার পিতা-মাতা ছিলো নেককার ও ঈমানদার। হযরত খিযির আ. বলেন, আমার আশংকা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে নেককার ও ঈমানদার পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দিবে। সে নিজে কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্যে ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালোবাসায় পিতা-মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে। (৫/২৬০)

সন্তানকে ইলমে দীন থেকে বঞ্চিত করলে, পিতা-মাতা অন্তিম শয্যায়ও তার খিদমত থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা পিতা-মাতার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাদেরকে কালিমার তালকীন দিতে পারে না। তাদের পার্শ্বে বসে সূরাহ ইয়াসীন তিলাওয়াত করলে, আছানীর সাথে তাদের রুহ বের হতে পারে। কিন্তু কুরআন বঞ্চিত সন্তান থেকে পিতা-মাতা এ সেবাও লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ হচ্ছে- পিতা-মাতার জানাযার নামায তার সন্তান পড়াবে। কারণ- সন্তান যে দিল নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্রন্দন করতে পারে, এটা দুনিয়ার অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। ইলম বঞ্চিত সন্তান থেকে পিতা-মাতা জানাযার ক্রন্দন ইত্যাদিও আশা করতে পারে না। আর মুর্দাকে কবরে ডান কাতে শোয়ানো জরুরী অর্থাৎ জীবিত মানুষ যেভাবে সুন্নাত তরীকায় ডান কাতে শোয়, মুর্দাকে সে ভাবে শোয়াতে হয়। তার সীনা ও চেহারা সবই কেবলার দিকে রাখা জরুরী। সন্তানকে কুরআনী শিক্ষা থেকে মাহরূম করলে, পিতা-মাতা সঠিক তরীকায় দাফন হওয়া থেকেও বঞ্চিত হয়। তাছাড়া পিতার নাজাত ও মাগফিরাতের জন্য সন্তান কুরআনে কারীমের সহীহ তিলাওয়াত থেকে দুরে রাখলে, তারা পিতা-মাতার ছাওয়াব রিসানীর জন্য কুলখানী, চল্লিশা ইত্যাদি বিদআতী ও হিন্দুয়ানী তরীকার আশ্রয় নিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহীহ তরীকায় পিতা-মাতাকে ছাওয়াব রিসানী করতে সক্ষম হয় না। পিতা-মাতা তাদের থেকে শরীআত সম্মত পন্থায় কোন উপকার হাসিল করতে পারে না। সন্তানকে দীনী ইলম থেকে মাহরূম রাখার কারণে পিতা-মাতা এভাবে অপূরণীয় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

পরকালীন তথা কবর ও হাশরের ক্ষতি

সন্তানকে ইলমে দীন থেকে বঞ্চিত রাখলে, উক্ত সন্তান পিতা-মাতার জন্য কবর ও হাশরের ময়দানেও সমূহ বিপদের কারণ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার সমুদয় আমল বন্ধ হয়ে শুধুমাত্র তিনটা আমলের ছাওয়াব জারী থাকে। যথাঃ

(১) সদকায়ে জারিয়া, যেমন-রাস্তাঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা-তৈরী করে দেয়া।

(২) ইলম দীন রেখে যাওয়া, যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হতে থাকে। যেমন-দীনী কিতাব পত্র সহজ সরল ভাষায় লিখে গেল, যার দ্বারা সাধারণ লোকেরা দীনের বুঝ হাসিল করলো।

(৩) দীনদার ও নেক সন্তান রেখে যাওয়া, যে তার জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকবে। সন্তানের দু'আর উসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা তার পিতাকে মাফ করে দেন এবং সন্তান দুনিয়াতে যত নেকী করতে থাকে, লোকদেরকে কুরআনের তা'লীম দিতে থাকে, সন্তান পিতা-মাতার জন্য দু 'আ করুক আর নাই করুক, যেহেতু পিতা-মাতা সন্তানকে দীনী তা'লীম দিয়েছেন এ জন্য তারা সন্তানের সমস্ত নেকীর মধ্যে শামিল হয়ে যান। অথচ সন্তানের নেকী কম করা হয় না। এভাবে দেখা যায়- মৃত্যুর সময় হয়ত তার গুনাহের পাল্লা ভারী ছিল, কিন্তু সন্তানদের নেক আমল যোগ হতে থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত তার নেক নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যায় এবং তার মাগফিরাত ও নাজাত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পিতা-মাতা যদি সন্তানকে দীনী তা'লীম না দেয়, তাহলে ঐ সন্তান পিতা-মাতার জন্য ছাওয়াব রেসানী করতে পারে না। সমস্যা শুধু এতটুকু নয়, বরং ঐ সন্তান শরী' আতের ইলম না রাখার দরুন তার দ্বারা যত ধরনের অন্যায় অপরাধ সংগঠিত হতে থাকে, তাকে ইলম দীন থেকে মাহরূম রাখার অপরাধের দরুন পিতা মাতা তার প্রত্যেকটি অন্যায়েরে গুনাহর মধ্যে শরীক হতে থাকেন। যেমন- ধরুন, ইলমে দীন না থাকার দরুন সন্তানের হালাল-হারামের ব্যাপারে কোন ধারণা অর্জিত হয় না, হারাম রিযিকের কুফল সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান থাকে না। সে জানে যে, হারাম রিযিক দ্বারা যে শরীরকে প্রতিপালন করা হয়, সে শরীরের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান, সুদের একটি দিরহাম/টাকা গ্রহণ করা ৩৬ বার যিনার সমতুল্য অপরাধ। তার চেয়ে মারাত্মক কথা, সুদের লেন-দেন ত্যাগ না করলে, তাকে আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সবের নির্ঘাত পরিণাম ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করা। এসবের ইলম তাকে শিক্ষা না দেয়ার দরুন সে অবাধে সুদ-ঘুষ গ্রহণ করতে থাকে; আরো নানাবিধ অন্যায়ের মধ্যে সে জড়িত হয়ে পড়ে, যেমন- সিনেমা, টিভি, ভিসিআর, নাচ, গান ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে পরে। এমন কি অনেকে মদ ও জুয়াতেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর কোন কোন দুর্ভাগ্য তো ঈমান-ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান-নাস্তিক পর্যন্ত হয়ে যায়। এসব অন্যায় অপরাধের জন্য যেহেতু তার পিতা-মাতা কারণ, যেহেতু তার সন্তানের হক আদায় করেনি, তাদের সহীহ ইলম শিক্ষা দেয়নি, তাই তারা সন্তানের সকল গুনাহের মধ্যে শরীক হয়ে যায়। এমনকি মৃত্যুর সময় হতে পারে যে, তার গুনাহই কম ছিল, কিন্তু এ ধরনের দীন বিমুখ ২/৪ টি সন্তান রেখে যাওয়ার দরুন তাদের সমস্ত অন্যায়ের সমষ্টি পিতা-মাতার আমল নামায় যোগ হতে থাকল। তখন তার গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে গেল এবং কবরের ভয়াবহ আযাবে পাকরাও হয়ে গেল। তদুপরি সন্তানদের অন্যায়

যতই বাড়তে থাকে। তাঁর আযাবও ততই বাড়তে থাকে। সে ব্যক্তি সন্তানের মায়ায় নিজের সম্পত্তি থেকে মসজিদ-মাদ্রাসা ও কুরআন কায়িমের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করেনি। অথচ সেই সম্পত্তি তার সন্তানরা তার ছাওয়াব রেসানীর জন্য দীনী কাজে ব্যয় না করে বিভিন্ন অন্যায় ও হারাম কাজে ব্যয় করতে থাকে। আর শাস্তি তাদের পিতা মাতা কবরে ভোগ করতে থাকে। এভাবে কিয়ামতের পর্যন্ত পিতা মাতা একদিকে নিজের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে থাকে, অপর দিকে সন্তান তথা দীনী শিক্ষা বিমুখ ছেলে-মেয়েদের অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করতে করতে নিষ্পেষিত হয়। দুঃখ-যাতনা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ, অপমান-অপদস্থ হওয়া ছাড়া আর কিছু তাদের ভাগ্যে জুটে না। এরপরে যখন কিয়ামত কায়েম হবে এবং হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ বিচারের জন্য একত্রিত হবে, তখন ঐ পিতা-মাতা চোখের সামনে এ জাতীয় সন্তানের কারণে পূর্বের চেয়ে আরো মারাত্মক পরিস্থিতি লক্ষ্য করবে।

একদিকে নিজের অপরাধের কারণে দিশেহারা। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না; বরং সকলেই ভাগতে থাকবে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানের হক নষ্ট তথা দীনী ইলম থেকে তাকে মাহরূম করার দরুন কৈফিয়ত তলব করবেন, অপরদিকে সন্তানের হক নষ্ট করে তাদের দীনী ইলম থেকে বঞ্চিত করে যে হত্যা তাদেরকে করা হয়েছে, হাশরের ময়দানে ঐসব হত্যাকৃত সন্তানেরা আল্লাহ্র দরবারে এই বলে মামলা দায়ের করবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় (তারা বলবে-)

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (الأحزاب: ٦٨)

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও সর্দারদের এবং বড়দের তথা পিতা-মাতার কথা মেনেছিলাম। কিন্তু তারা আমাদেরকে (কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা না দিয়ে বরং দীন বিমুখ ভ্রান্ত বিষয়ের শিক্ষা দিয়ে) পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের উপর লানত, মহা অভিসম্পাত নাযিল করুন।" (সূরাহ আহযাব, ৬৭-৬৭)

চিন্তা করুন, যে সন্তানের জন্য হাজার হাজার টাকা নির্দ্বিধায় পানির মত ব্যয় করা হলো, দুনিয়াতে তো তার দ্বারা কোন খিদমত পাওয়া গেলই না মৃত্যুর সময় সূরাহ্ ইয়াসীন তিলাওয়াত, কালিমার তালকীনও করতে পারলো না, পিতা-মাতার জানাযা পড়াতেও সক্ষম হলো না, সহীহ তরীকায় পিতা-মাতার কাফন-দাফনও করতে পারলো না, কবর যিয়ারত, সাওয়াব রেসানীও করতে পারলো না। বরং কবর-আযাব বৃদ্ধির কারণ হলো এবং হাশরের ময়দানে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে হত্যা কেসের মামলা দায়ের করলো। তারা যতটুকু-শাস্তির উপযুক্ত ছিলো, সেই শাস্তিকে দ্বিগুণ করবার জন্য এবং লানত নাযিল করার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দরখাস্ত করলো।

এসব পিতা-মাতা নেক সন্তানের মহাদৌলত ও মহা সুফল থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হলো এবং সন্তানের কারণে ভয়াবহ আযাবের স্থান জাহান্নামের উপযুক্ত সাব্যস্ত হলো। তাদের যিন্দেগী একেবারে বরবাদ হয়ে গেলো। সন্তানের জন্য তারা প্রচুর মেহনত করেছে বটে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ বাদ দিয়ে গলত তরীকায় মেহনত করার দরুন তাদের জীবন ষোল আনাই বৃথায় পর্যবসিত হল। সন্তানকে দীনী শিক্ষা থেকে মাহরূম করার দরুন একদিকে তারা পিতা-মাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে, অপরদিকে যার সুপারিশ ব্যতীত হাশরের ময়দানে নাজাতের কোন সুরত থাকবে না, সেই রাহ্মাতুল্লিল আলামীন, শফীউল মুজনিবীন আখিরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও সন্তানকে, কুরআনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে দুনিয়াতে কুরআন কায়িম করার প্রচেষ্টা না করার দরুন পিতা-মাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان:٣٠)

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ করবেন, “হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় পবিত্র কুরআনকে পরিত্যাগ করে রেখেছিল।” (সূরাহ ফুরকান, ৩০)

কুরআনকে পরিত্যাগ করার বাহ্যিক অর্থ-কুরআনকে অস্বীকার করা যা কাফিরদের কাজ। কিন্তু রিওয়ায়াত দ্বারা একথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত তিলাওয়াত করে না এবং এর উপর আমল করে না। (আমলের মধ্যে ঈমান নামাযের সাথে একথাও আছে যে, সন্তানদের কুরআনের তালীম দিয়ে কুরআনকে বিশ্বের বুকে স্থায়ীভাবে কায়িম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলমান হয়ে যারা কুরআনের উপর আমল করে না, কুরআনকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করে না, তারাও এ অভিযোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসামী সাব্যস্ত হবে।

আল্লাহ্ তা’আলা সন্তানদেরকে শুধু পিতা-মাতার দুনিয়া সাজানোর উদ্দেশ্যে দেননি। বরং আল্লাহ্ তা’আলার মহান উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে যে সন্তান লাভ করে- তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এবং আল্লাহ্‌র যমীনে কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কুরআনী শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। সন্তানকে দীনী শিক্ষা না দেয়া আল্লাহ্‌র এ মহা নিয়ামতের নাশোকরী ছাড়া আর কিছুই নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তদীয় সাহাবাগণ রাযি. কত ত্যাগ, কুরবানী ও শাহাদতের বিনিময়ে এ কুরআন কায়িম করেছেন এবং পরবর্তী লোকদের নিকট আমানত রেখেছেন, যেন তারা নিজেরা কুরআন শিক্ষা করে নিজের সন্তানাদি ও পরিবারের সকলকে কুরআন শিক্ষা দিয়ে কুরআনের এ আমানতকে সংরক্ষণ করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যমীনে- কুরআন কায়িম রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তথা মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করে এবং সেখানে কুরআন শিক্ষার জন্য

নিজের সমস্ত সন্তানদের প্রেরণ করে ও অন্য ভাইদেরকে তাদের সন্তানকে কুরআনী শিক্ষা দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

মুসলমানরা দুনিয়ার চারটা পয়সার লোভে সামান্য কয়েকদিন দুনিয়াতে ফুর্তি করার মোহে যদি সন্তানকে দীনী শিক্ষা থেকে মাহরূম করে রাখে, তাহলে এটাই তাদের বড় শাস্তি যে, স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র দরবারে নালিশ ও মামলা দায়ের করবেন।

এখন প্রত্যেকে নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন-কুরআন কায়িম করার জন্য সন্তানদের কুরআনী শিক্ষা দিয়েছেন কি না এবং কুরআনকে সংরক্ষণের জন্য মাদ্রাসা কায়িমের ব্যাপারে কতটুকু ভূমিকা বা অবদান রেখেছেন? যদি এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করুন। আর দায়িত্ব পালন না করে থাকলে! নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নালিশ-মামলা থেকে বাঁচার জন্য কি ব্যবস্থা করবেন, তা উলামায়ে কিরাম থেকে জেনে নিয়ে এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র দুনিয়া; আখিরাত তো ফল ভোগের স্থান। সেখানে সমস্যা সমাধানের কোন উপায় নেই।

একটি ভ্রান্তির অপোনোদন

কুরআন হাদীসে “ইলম” শব্দ দ্বারা পার্থিব শিক্ষা উদ্দেশ্যঃ

অধুনা অনেক স্কুল-কলেজের গেইটে বা মনোগ্রামে একটি আয়াত বা একটি হাদীস লিখে রাখতে দেখা যায়। আয়াতটি হলোঃ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طه:١١٤)

অর্থাৎ “হে আল্লাহ্‌ আমার ইলম তথা দীনী জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।”

আর হাদীসটি হলোঃ طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থাৎ “দীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।”

এ আয়াত, ও হাদীসের মর্মের সাথে স্কুল-কলেজের শিক্ষার সামান্যতম সম্পর্কও নেই। কারণ-এ আয়াতে ও হাদীসে দীনী ইলমের কথা বলা হয়েছে। দুনিয়াবী বিদ্যা যার দ্বারা পয়সা করি রোজগার করা যায়, দুনিয়ার উন্নতি করা যায়, দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা হয়, দুনিয়ার চীজ ও আসবাবের চাকচিক্য বৃদ্ধি করা যায়, এ ধরণের বিদ্যার সাথে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের কোন সামান্য সম্পর্কও নেই। ওসব বিদ্যা হালাল রিযিক অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা করা জায়িয থাকলেও তার তালীম দেয়ার জন্য নবী-রসূলগণের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন ঘটেনি, আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়নি। তবে দর্জি বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা, বিভিন্ন রকম মিস্ত্রি বিদ্যা হালাল রিযিক অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা করা যেমন জায়িয, জরুরী নয়, তেমনিভাবে ডাক্তারী বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল, সায়েন্স ইত্যাদি বিদ্যা শিক্ষা করা জায়িয, জরুরী নয়।

তবে নিছক এসব বিদ্যার আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষ কোন পজিশন বা ফজীলত নেই। যেমন- দর্জি বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা, সকলের জানা মতে, কোন ফজীলতের বিষয় নয়, শুধুমাত্র হালাল রিযিক উপার্জনের একটি মাধ্যম মাত্র।

এখন লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস স্কুল-কলেজের গেইটে বা মনোগ্রামে লিখার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত পণ্ডিতগণ উপরোক্ত আয়াত বা হাদীসকে স্কুলের গেইটে লিখেছেন, তারা মনে করেন যে, উক্ত আয়াত ও হাদীসে ইংরেজদের সিলেবাস অনুযায়ী তারা যে দুনিয়াবী বিদ্যা শিক্ষা দেন, তার কথা বলা হয়েছে বা উক্ত আয়াতে ও হাদীসের মর্মের মধ্যে তাদের বিদ্যাও শামিল। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের এ-ধারণা সত্যের অপলাপ এবং কুরআনে-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতারই, পরিচায়ক। দেখুন, স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নির্দেশ দিচ্ছেন- "হে নবী! আপনি বলুন, হে আমার পালন কর্তা রব! আপনি আমার ইলমকে বৃদ্ধি করে দিন।" এখানে কি দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে? তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কেন দুনিয়াবী বিদ্যা বৃদ্ধি করা হলোনা এবং কেনইবা তিনি সাহাবাগণকে দুনিয়াদাবী বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন না? বরং তিনি নিজেই সাহাবাগণকে রাযি. লক্ষ্য করে বলেছেন- "তোমরা দুনিয়াবী বিষয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার থেকে বেশী জান।" (মুসলিম শরীফ ২৩৬৩)

এটা তো আশ্চর্যের কোন কথা নয়। কারণ- একজন লোকের নিকট দুনিয়াবী বিষয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বহু বিষয় বহু লোক তার চেয়ে পারদর্শী প্রমাণ লাভ হতে পারে। অথচ এতে তার মর্যাদার হানী হবে না। যেমন, উক্ত ডিগ্রীওয়ালার চেয়ে মাছ ধরার ব্যাপারে জেলেদের অভিজ্ঞতা বেশী, চাষাবাদের ব্যাপারে কৃষকদের অভিজ্ঞতা বেশী, ইত্যাদি।

তেমনিভাবে হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে যে, "ইলমে দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।"

যদি বলা হয় যে, হাদীসের মধ্যে দুনিয়াবী বিদ্যাও শামিল আছে, তাহলে প্রশ্ন হবে, আম্বিয়ায়ে কিরামগণ কি ইংরেজদের রচিত বা দুনিয়াদারদের তৈরিকৃত এ বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন বা দিয়েছিলেন? সাহাবাগণ রাযি. কি এসব সুদ কষা, এ্যালজ্যাবরা, ভুগোল, সায়েন্স, আর্টস, কমার্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা হাসিল করেছিলেন? নিশ্চয় তারা কেউ এসব বিদ্যা হাসিল করেননি। বরং এসব বিদ্যা থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদেরকে বিশেষ ভাবে হিফাজত করেছিলেন। যাতে করে এমন নিম্নমানের বস্তু নিয়ে গবেষণায় তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট না হয়।

এসব গবেষণার জন্য কাফির-নাস্তিককে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ ওয়ালাদের সময়তো অনেক মূল্যবান কাজের জন্য ব্যয় হয়ে থাকে। তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকে এবং পথভোলা মানুষদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে জুড়ে দেয়ার

কাজে ব্যস্ত থাকেন। অপরদিকে কাফির/নাস্তিক যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত ইখতিয়ার করেনি, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তার ওলীদের খিদমতে লাগিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা যদি আল্লাহ্‌র গোলামী ইখতিয়ার করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান ইত্যাদির কাফিরদের মুসলমানদের গোলাম ও চাকর বানিয়ে দিবেন। খিলাফতে রাশিদীনের যুগ তার প্রকৃষ্ট নজীর।

যাই হোক, আমি বলছিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণ পার্থিব বিদ্যা শিখেননি, নিষেধও করেন নি। এ দ্বারা বুঝা যায়, এসব বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ নয়। কুরআন-হাদীসের পরিভাষা অনুযায়ী এগুলো "ইলমে" দীন নয়। সুতরাং এ গুলো শিক্ষা লাভ করে কেউ এ দাবী করতে পারে না যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইলম শিক্ষা করা ফরজ করে দিয়েছেন, আমি সাইন্স/আর্টস/কমার্স পড়ে সে ফরজ আদায় করে ফেলেছি। এরূপ দাবী করলে, কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। স্কুল-কলেজের শিক্ষা দ্বারা ইলমে দীন শিক্ষার ফরজ কস্মিনকালেও আদায় হবে না। বরং তাদের মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে হোক বা দীনী কিতাব পত্র পড়ে হোক বা খানকাহ, দাওয়াত ইত্যাদি যে কোন লাইনে যেয়ে হোক, বা উলামা কিরামের সাথে উঠাবসা ও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার মাধ্যমে হোক, ফরজে আইন পরিমাণ দীনী শিক্ষা লাভ করা তাদের জন্য জরুরী। নতুবা তারা ফরজ তরক গুনাহে গুনাহগার হবে।

সারকথা, স্কুল-কলেজের গেইটে বা মনোগ্রামে উক্ত আয়াত ও হাদিস লেখা উচিত নয়। এর দ্বারা ঐ আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করা হয়।

ইংরেজী শিখে ইংরেজ বনা নাজায়িয

স্কুল-কলেজের শিক্ষা অর্জন করা ফরজ নয়। বরং উক্ত শিক্ষার কুফল থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ শর্তের সাথে হালাল রিযিক উপার্জনের লক্ষ্যে জরুরত পরিমাণ উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করা জায়িয আছে বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই ইংরেজী বিদ্যা শিখে ইংরেজ হওয়া জায়িয নয়। অর্থাৎ নিজের জাতীয় বোধ, ইসলামী মূল্যবোধ হারিয়ে ইংরেজদের চাল চলন বেশভূষা গ্রহণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় অথচ এটাই ইংরেজী বিদ্যার কুফল। ইংরেজী বিদ্যার সিলেবাস যারা প্রথম ভারতবর্ষে চালু করে, তারাই এর ফলাফল সম্পর্কেও ভবিষ্যতবাণী করেছে। ক্রমেই তাদের সে ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে দেখা যাচ্ছে।

ইংরেজ লেখক লর্ড ম্যাকেল বলেছে যে, আমরা ভারতবর্ষে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছি, যার দ্বারা এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা রং ও বর্ণের দিক দিয়ে ভারতীয় হবে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক ও কৃষ্টি-কালচারের দিক দিয়ে হবে বিলাতী। উইলিয়াম হান্টার লিখেছে- আমরা এদেশে এমন এক সিলেবাস দিয়ে গেলাম, যার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে এদেশের যুবক-যুবতীরা তাদের মুসলমান পিতা মাতাকে বেকুব মনে করে উপহাস করবে। অর্থাৎ তারা যেহেতু নাস্তিক হবে, সুতরাং আস্তিক পিতা-মাতাকে বেকুব মনে

করাটাই তাদের জন্য স্বাভাবিক। এসব ভবিষ্যতবাণীর সারমর্ম হলো- ইসলাম বিমুখ এ সিলেবাস পড়ে শিক্ষিত লোকেরা নাস্তিকে পরিণত হবে এবং এদেশে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম সম্পন্ন নাগরিক থাকবে না। এর পরিবর্তে ইংরেজদের তোষামোদকারী এবং সকল বিষয়ে তাদের অন্ধ অনুসরণকারী লোক তৈরী হবে। তাদের নিকট দেশ, জাতি, ঈমান ও ইসলামের চেয়ে ইংরেজদের আনুগত্য বেশী জরুরী ও ভাল সাব্যস্ত হবে। যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি চক্ষু খুললে এসব ভবিষ্যতবাণীর বাস্তবতা আয়নার ন্যায় পরিস্কার দেখতে পাবেন। তাদের একটি মন্তব্যও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়নি।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা অত্যন্ত চিন্তা-ফিকির, বিচার-বিশ্লেষণ করেই এ সিলেবাসটি তৈরী করেছিলো এবং মুসলিম মিল্লাতকে দীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে আজীবন ইউরোপীয় গোলামীর জিঞ্জির পরানোর জন্য এটি ছিল তাদের সুপরিকল্পিত গভীর নীল নকশা। যার পরিণতিতে মুসলমানগণ আজ তাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নমুনা ও আদর্শকে নিজেদের আদর্শ না বানিয়ে চির দুশমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নমুনা ও আদর্শ বানিয়ে তাদের অনুকরণ করে ধ্বংসের অতল গহ্বরে দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে। ফলে খোদায়ী গজব স্বরূপ দুনিয়াতে তারা কাফিরদের হাতে মার খাচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে কিন্তু তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই। আল্লাহ্ তা’আলা তো সাহায্য করবেন তার নবীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুকরণের শর্তে। কিন্তু দিশেহারা উম্মত ভুলক্রমেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না। যেটা তাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ, বারবার সেটাকেই গ্রহণ করছে।

উম্মতের দুরবস্থার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে ইংগিত করেছেন। তার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ উম্মত এক সময় কুরআন-সুন্নাহর ইলম ছেড়ে দিয়ে তাদের নবীর স্থলে পরবর্তী বিধর্মীদের তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণ শুরু করবে। যেমন এক রিওয়ায়াতে আছে- নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমরা পূর্ববর্তী উম্মত-তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের এমন ভাবে অনুসরণ শুরু করবে, যেমন দুইটা স্যান্ডেল একটা অপরটার সমান থাকে।” কোন কোন হাদীসে এসেছে- “গজে-গজে বিঘতে-বিঘতে তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে অপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের অনুকরণ করতে যেয়ে তোমরাও তাই করবে।” (নাউযুবিল্লাহ) (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ১১/৩৬৯)

অন্য হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে- “তাদের-কেউ যদি গুই সাপের গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে অন্ধ অনুকরণ করতে যেয়ে বাহ্যিকভাবে কোন কারণ না বুঝলেও তাদের অনুকরণের প্রবণতায় তোমরাও সেই গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করবে।” (বুখারী শরীফ ২/৮৫১)

এই হলো ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণের সামান্য নমুনা। এজন্যই উলামায়ে কিরাম বলেন যে, দুনিয়াবী জায়িয জরুরতে বা দীনের জরুরতে নিজের দীন-ঈমানকে হিফাজত করে জরুরত পরিমাণ ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করা জায়িয আছে, কিন্তু ইংরেজ হওয়া অর্থাৎ তাদের গোলামী করা বা তাদেরকে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ও সভ্য জাতি বিশ্বাস করা বা আল্লাহ্-রাসূলের নির্দেশ উপেক্ষা করে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা কোন ক্রমেই জায়িয নয়।

এ ব্যাপারে বিগত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর ফাতওয়া প্রত্যক্ষ করুনঃ হযরত থানবী রহ. ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা লাভের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম বা বিধান বর্ণনা করার লক্ষ্যে প্রথমে কুরআন ও হাদীসের ১০টি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর উক্ত ১০টি মূলনীতির ভিত্তিতে ইংরেজী লাইনে পড়ার ব্যাপারে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। মুজাহিদে আজম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে তার ফাতাওয়ার অনুবাদ নিম্নে হুবহু পেশ করা হচ্ছেঃ

হযরত থানবী রহ. বলেনঃ "ইংরেজী একটি ভাষা। ভাষা হিসেবে যে কোন একটি ভাষা শিক্ষা করা প্রকৃত প্রস্তাবে হারাম বা পাপ হতে পারে না। বর্তমানে ইংরেজী শিক্ষা বলতে শুধু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বুঝায় না, ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অংক, ইতিহাস, ভূগোল-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান, নক্ষত্র-বিজ্ঞান, মনস্তত্ব-বিজ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সমূহও বুঝা যায়। এ সমস্ত বিষয় শিক্ষা করাও প্রকৃত প্রস্তাবে হারাম বা পাপ হতে পারে না। অবশ্য যদি এ ভাষা এবং এ বিষয় সমূহ শিক্ষা করার সাথে সাথে অন্য কোন উপায়ে অন্য কোন কারণে ধর্মের শিথিলতা, ঈমানের বিরোধিতা ও শরী' আতের খিলাফ চলাফেরা পরিলক্ষিত হয়, তবে তা হারাম হবে। অর্থাৎ উক্ত শিক্ষা নিজে পাপের কাজ না হলেও বিভিন্ন পাপের কারণ হওয়ায় তা এখন পাপের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। যখন প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মের শিথিলতা, ঈমানর বিরোধিতা এবং শরী' আতের খিলাফ চলাফেরা দেখা দিবে, তখন ঐ শিক্ষা নিজে জায়িয হওয়া স্বত্তেও এই সব কারণে হারাম এবং নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এখন চিন্তা করে দেখুন এবং অনুসন্ধান করে দেখুন বর্তমানে ইংরেজী লাইনে পড়ার দরুন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির খারাপ পরিবেশের কারণে মুসলমানের সন্তানেরা দীনদারী তো ছাড়ছে, এমনকি আজকাল অনেক বই পুস্তকে পর্যন্ত শরী' আতের খিলাফ কথা লেখা হচ্ছে এবং অনেক স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির অনেক শিক্ষকও শরী' আতের খিলাফ বক্তৃতা পর্যন্ত দিতে দুঃসাহস করতেছেন। নামায-রোযা পালন সম্বন্ধে শিথিলতা তো এসেই গেছে, এমন কি অনেক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে নামায-রোযার আবশ্যকতা ও ফরযিয়্যাত সম্বন্ধে সন্দেহ করতে এমন কি ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পর্যন্ত সন্দেহ করতে শুনা যায়। (নাউযুবিল্লাহ) এতদ্ব্যতীত নিজেদের জাতীয় গৌরববোধ, নিজেদের জাতীয়

আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ববোধ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ হারিয়ে ফেলছেন। তাঁদের মধ্যে Superilority complex -এর পরিবর্তে অহংকার এবং গরীব মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, পীর-উস্তাদ, আলেম-তালিবে ইলম, গরীব জনসাধারণ মুসলমানদের প্রতি একটা তুচ্ছভাব এসে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে inferiority complex ঢুকে গেছে। নিজের জাতীয় পোশাক, জাতীয় চাল-চলেন, জাতীয় ছুরত-সীরতের প্রতি অবজ্ঞার ভাব এসে যাচ্ছে। ঘুষ, সুদ Smuggling, black marketing, overtaxing, নেশাপান, যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা, নাচ-গান কুৎসিত ছবির নেশা ইত্যাদি দুর্নীতিও ঢুকে যাচ্ছে এবং বিজাতীয় অনুকরণ করা যে Inferiority complex বশতই হয়ে থাকে, এই অনুভূতিটুকু এবং এই খেয়ালটাও চলে যাচ্ছে। বরং যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকা, ইউরোপ যাচ্ছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানের চেয়ে, জ্ঞান অনুশীলনের চেয়ে, সেই দেশীয় নেকটাই, clean shave, বেপর্দা, বে-হায়ায়ী এবং কপটতা, কৃত্রিমতা ও বাহ্যিক আড়ম্বরই আমদানি করতেছে বেশী। এ সবই ঈমানের বরবাদী। কেননা-এ কাজগুলো সবই ইসলাম বিরোধী ও হারাম। সুতরাং আসলে ইংরেজী শিক্ষা হারাম না হলেও যেহেতু ইংরেজী শিক্ষার সংগে সংগে ইসলাম বিরোধী এ পাপগুলো এসে পড়তেছে, এসব কারণই এ শিক্ষাকে পাপ এবং হারাম করে দিচ্ছে।

এতদ্ব্যতীত দিবারাত্র আখিরাতের কথা, ধর্মের কথা, নৈতিক চরিত্রের উন্নতির কথা, আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা মোটেই আলোচনা না করে বরং সে আলোচনাকে মোল্লাকী খেয়াল মনে করে সদাসর্বদা শুধু অর্থলোভ এবং পদের মোহের চিন্তা-চর্চা এবং চেষ্টা করাই হচ্ছে তাদের পেশা এবং সে চেষ্টার বদৌলতে শরী’ আতের হুকুম-আহকাম পালনের আদৌ খিয়াল না রাখাই হচ্ছে তাদের অভ্যাস। একেই তো বলা হয় অভিশপ্ত দুনিয়া। অধিকন্তু অভিশপ্ত দুনিয়ার চিন্তা-চর্চার চেষ্টার নাম তারা বদলিয়ে রেখেছে উন্নত খেয়াল, উন্নতির চেষ্টার নামে। কিন্তু নাম বদলালে তাতে আসল হাকীকাত বদলিয়ে যায় না।

অবশ্য এরূপ তাছির সকলের মধ্যে পয়দা হয় না বা পূর্ণ মাত্রায় পয়দা হয় না বটে, কিন্তু শতকরা দশ জন বোধ হয় এরূপ তাছির থেকে বেঁচে থাকার কি মূল্য হতে পারে? অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার আসল তাছির ও প্রক্রিয়া যে ছেলে পেলেদেরকে খারাপ করে দেয়, একথা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে, যেমন পূর্বে majority must be granted বলা হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার এরূপ তাছির ও প্রক্রিয়া হওয়ার কারণ কি? ধর্মহীন শিক্ষকদের কুসংসর্গের তাছির? না দর্শন ও তর্ক শাস্ত্র পড়ার তাছির? না ধর্মহীন পাঠ্য পুস্তক প্রণেতাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, যা পাঠকদের মনের উপর! তাদের মনের ও জ্ঞানের অগোচরে আস্তে আস্তে গোপনে পড়তে থাকে! সে যাই হোক না কেন, কারণ যাই থাকুক না কেন, যখন তাছির চাক্ষুষ দেখা যাবে এবং শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সেখানে কারণ অনুসন্ধান করার আর প্রয়োজন খাকে না।

এমন কি যদি কেউ যুক্তি দ্বারা তার খিলাফ প্রমাণ করে দেয়, তবে সে যুক্তিও বাস্তব ও চাক্ষুষ প্রমাণের সামনে গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য যদি কেউ দুনিয়ার জরুরতের জন্য অর্থাৎ যদি রুজি-রোজগারের অন্য কোন উপায় না থাকে এবং শরী' আত অনুসারে জরুরী প্রমাণিত হয়, অথবা দীনের জরুরতের জন্য-যেমন যদি কেউ বিদেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য বা ইংরেজী ভাষায় ইসলামী বিষয় প্রকাশ করার জন্য অথবা ইংরেজী ভাষায় ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে যা কিছু লিখেছে, তার যুক্তি খণ্ডন করার জন্য বা ইসলামের প্রভাব বিস্তার করার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে এবং উপরিউক্ত খারাবী হতে নিজেকে অতি সতর্কতার সহিত বাঁচিয়ে রাখে তবে অবশ্য এরূপ লোকের জন্য আবশ্যিক পরিমাণ ইংরেজী পড়া জায়িয হবে। কিন্তু অতি সতর্কতা সহকারে পড়তে হবে। কাজ না করে শুধু মানুষের চোখে ধূলা দেয়ার জন্য ভাল নিয়তের কথা প্রকাশ করার কোনই মূল্য নেই।

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রত্যেক ন্যায় বিচার ও নির্মল বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, বর্তমান যুগের ইংরেজী শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণ শরীআতের খিলাফ ও পাপের পথ। যদি কোন আলেম বা বিশ্বস্ত জ্ঞানী লোক এর বিরুদ্ধে কিছু বলেন, তবে তার অর্থ এই হবে যে, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে হয়ত প্রমাণ করবেন যে, অমুক লোকের মধ্যে ইংরেজী পড়ার যে সব তাছিরের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, সে সব তাছির পয়দা হয়নি। কাজেই তার পাপ হয়নি বা সে শরী' আতের খিলাফ কাজ করেনি। নতুবা এ অর্থ হতে পারে না যে, কোন বিশ্বস্ত জ্ঞানী লোক বা কোন বিশ্বাসযোগ্য আলেম যে সমস্ত খারাব তাছির পয়দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইংরেজী পড়াকে জায়িয বলেছেন। এরূপ ব্যক্তিগত মত বিরোধ আমার বর্ণনার বিপরীত নয়। কেননা সেটা অর্থাৎ অমুক লোকের মধ্যে ঐ বিষ ঢুকেনি, শরী' আতের কোন মাসআলা নয়। বরং শরী' আতের মাসআলা এটা যে, যদি বিষ ঢুকে, খারাব তাছির ঢুকে, তবে তা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং পাপ। এমতাবস্থায় যদি এমন কোন বন্দোবস্ত করা যায়, যাতে বিষ না ঢুকতে পারে, সেটুকু হাসিল করে নেয়া যায়, তবে তখন হারামের এবং পাপের হুকুম থাকবে না। কিন্তু সেরূপ ওয়াকিয়ার দৃষ্টান্ত বিরল।" (ফাতাওয়াটি শেষ হলো।)

এরপরে ইংরেজী বিদ্যা সম্পর্কে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর বক্তব্য শুনুন। তিনি সাধারণ উলামায়ে কিরাম থেকে ভিন্ন ধরনের ছিলেন। কারণ-একদিকে তিনি মুহাক্কিক আলেম ছিলেন এবং হযরত মাওলানা থানবী রহ. এর কামিল মুকাম্মাল উত্তরসূরী ছিলেন, অপরদিকে ইংরেজী লাইনেও উচ্চ ডিগ্রী ধারী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং ইংরেজী লাইন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা শুধু দীনী লাইনে শিক্ষিত উলামাগণের থেকে নিঃসন্দেহে বেশী ছিল। ইলমের ফযীলত কিতাবের ভূমিকার মধ্যে তিনি বলেনঃ

“যে দিন হতে মুসলিম শাসনের পতন হয়েছে, সে দিন হতে শত্রুরা ব-কলম নাম দুর করবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদীর অপর পারের একটি অদ্ভুত ভাষা শিক্ষা করার শর্ত লাগিয়েছে। দেশীয় ভাষায়, জাতীয় ভাষায় বা ধর্মীয় ভাষায় যে যতই অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হয়ে জীবনকে উৎসর্গকারী হোক না কেন, রাজ-দরবারে তাকে কোন মান-সম্মানই দেয়া হয় নি। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সদুপায়ে ও সম্মানের সহিত জীবিকা নির্বাহের উপায়ও তার জন্য রাখা হয় নি। আদমশুমারীর মানুষ গণনার লিষ্টেও তার নাম নিরক্ষরের পর্যায়ই রাখা হয়েছে যে, সব কাজে তারা ভোট দেয়ার অধিকারী হন না। হায়রে যুলুম! হায়রে অন্যায়!!

যে দিন হতে মুসলিম ভাগ্যাকাশ ঘোর ঘণঘটাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তখন হতে সে অন্ধকার দুর করার জন্য অন্ততঃ আমাদের সতর্ক থাকাও উচিত ছিল। কারণ, শত্রুতো শত্রুতা করবেই, শত্রুকে গালি দিয়ে লাভ নেই। আমাদের উচিত ছিল, শত্রুর ফাঁদ হতে রক্ষা পাবার জন্য সতর্ক থাকা। কিন্তু আমরা তা না করে নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠারাঘাত করেছি। শত্রুর কুমন্ত্রণায়, শত্রুর প্ররোচনায় আমরাই আমাদের জাতীয় উন্নতিকে অবনতি করছি। জাতীয় গৌরবকে ভুলে যাচ্ছি। জাতীয় শিক্ষাকে শুধু যে পরিত্যাগ করেছি তা নয়, বরং তুচ্ছ ও ঘৃণা করতেছি তাই সুশিক্ষাকে কুশিক্ষা এবং কুশিক্ষাকে সুশিক্ষা বলতেছি। ইংরেজী ভাষার ভিতরে যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আছে, তাকে আমরা কু-শিক্ষা বলতেছি না। ইংরেজী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জাতীয়তা ভুলে যাওয়া, জাতীয় কৃষ্টি কালচারকে ভুলে যাওয়া, জাতীয় শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণকে তুচ্ছ মনে করা, জাতীয় লেবাস, পোশাক, আকৃতি, প্রকৃতি, ধর্ম নীতি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত হওয়ার যে বিষ দেশে ও সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে, তা-ই কুশিক্ষার পরিচায়ক।

ভাষা বিশেষে পারদর্শিতা লাভ করাকে সুশিক্ষা বলা হয় না। সুশিক্ষা বলে সুবিষয়ে পড়ে নৈতিক শিক্ষা লাভ করতঃ নৈতিক চরিত্রের উন্নতির দ্বারা জীবনকে সুগঠিত করাকে। আমাদের পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “উত্তম স্বভাবগুলোকে পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই আমি জগতে প্রেরিত হয়েছি।” এখানে নৈতিক শিক্ষার এবং উত্তম স্বভাবের কতকগুলো নমুনা উল্লেখ্য করতেছি, যথা- দয়া-মায়া, হায়া, ক্ষমা, সত্য কথা, দান, খাঁটি নিয়ত, ওস্তাদ ভক্তি, দায়িত্ব-জ্ঞান, পরমতসহিষ্ণুতা, ইমামের তাবেদারী, মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আসসালামু আলাইকুম বলে হাসি মুখে মিষ্ট কথায় আলাপ করে তার সন্তোষ ও সম্মান বর্ধন করা। ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, তৃষ্ণাতুরকে পানি দান, ক্রোধ সংবরণ, অন্যকে কষ্ট না দেয়া, জনসাধারণের ত্যক্ত-বিরক্তকে অম্লান বদনে সহ্য করা, খাওয়া-পড়া, উঠা-বসা ইত্যাদিতে অন্যকে অগ্রগণ্য করে নিজেকে পিছনে রাখা, অন্যে অন্যায় করলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ না করে নিজের বিচার নিজে করা, পরের উপকার করলে তা মনে না রাখা, অন্যে তোমার বিন্দুমাত্র উপকার করলেও চিরকাল তা মনে রাখা, সম্মানী ও

পদস্থ হলে গরীবকে যথাসাধ্য সাহায্য করা, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করা, তালিবে-ইলমদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাদের উৎসাহ বর্ধন, তাদের খিদমত এবং যথাসাধ্য সাহায্য করা। কেউ উযূ বা নামায পূর্ণরূপে আদায় করতেছে না দেখলে, নম্রভাবে দেখিয়ে দেয়া বা শিক্ষা দেয়া। এই ধরণের উত্তম স্বভাবগুলো শিক্ষা করার নামই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা। মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন অনেক টাকা বা অনেক ভোগ-বিলাসের মধ্যে হয়না। তা লাভ হয় সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে নৈতিক উন্নতি সাধন করায়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সুশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার মূল উৎস ইল্‌মে দীন ও ইসলামী আদব-কায়দাকেই লোকেরা আজকাল ভক্তির চোখে দেখছে না এবং তার মূল্য নিরূপণ করছেন।”

হযরত ফরীদপুরী রহ. উক্ত কিতাবের মধ্যে অন্যত্র বলেন-

“গোটা মুসলিম জাতি ও ইসলাম ধর্ম খ্রিষ্টানদের চোখের কাঁটা ছিল। যখন হতে ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসে মুসলমানদের সাম্রাজ্য তাদের হাত হতে ছিনিয়ে নিলো, তখন হতেই তারা শত্রুতার পরাকাষ্ঠা দেখাবার সুযোগ পেল। সমাজের গণ্যমান্য বুদ্ধিমান তেজস্বী তাঁরাই ছিলেন, যারা ছিলেন আলেম। তখন মোল্লা-মিষ্টারের ফেৎনা দেশে ছিল না। এ ঝগড়া ব্রিটিশের পয়দা করা। গণ্যমান্য তেজস্বী আলেমগণ ছিলেন স্বাধীনতা প্রিয়। ব্রিটিশরা তাঁদেরকে নির্মমভাবে ফাঁসী দিয়ে, কালাপানিতে নির্বাসন দিয়ে শেষ করে দেয়। কিন্তু ইংরেজ জাতি যেহেতু বড়ই দূরদর্শী ও চিন্তাশীল, সেইজন্য তারা প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা না করে বা প্রকাশ্যভাবে সমাজের নওনেহালদের বধ না করে মুসলমানদের রুহানিয়াতকে এবং ধর্মীয় ও জাতীয় জযবাকে বধ করার ষড়যন্ত্র করল। তারা শুধু ধর্মীয় এবং জাতীয় জযবাকেই বধ করে ক্ষান্ত হয়নি, অধিকন্তু তারা এমন দুইটি শিক্ষাধারা দেশে জারী করেছে, যার একটি ধর্মহীন কর্মশিক্ষা, আর একটি কর্মহীন ধর্মশিক্ষা। এর ফলে দু’ জনের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-কলহ পয়দা হয়েছে। অথচ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন বুঝতে এবং জানতে পারে যে, সে কোথা হতে এসেছে, তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাকে এই অস্থায়ী দুনিয়াতে কি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন? সে কোথায় যাবে? তার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যস্থল কোথায়? আল্লাহ্‌র কাছেই তাকে আবার ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে তিনি যে পুঁজি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে পুঁজিতে লাভ আছে, না লোকসান হয়েছে, সে হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে।

কি উদ্দেশ্যে সে এই দুনিয়াতে এসেছে? কি পুঁজি দিয়ে সৃষ্টিকর্তা তাকে পাঠিয়েছেন? কি সম্বল সঞ্চয় করার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন? সৃষ্টির বহু মূল্যবান জীবনের বহু মূল্যবান সময় এবং বহু মূল্যবান সামর্থ্য দিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন। শিক্ষার দ্বারা আলো এবং শক্তি হাসিল করে তার সেই পুঁজি ভাঙ্গিয়ে সময় ও সামর্থ্যের মর্যাদা বুঝে তার উপর উপযুক্ত মর্যাদা দান করে তার উৎকর্ষ সাধন করে এসব লাভ করে নিতে হবে। কিন্তু শিক্ষার ধারা এমন জারী করা হয়েছে, যার মধ্যে মানুষ তার আরম্ভ বিন্দু

কোথায়, তার লক্ষ্যবিন্দু কোথায়, তার জীবনের উদ্দেশ্যে কি, তার উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় কি, তার আত্মার শান্তি কোথায়, কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে এইটুকু যে, তার পেটে ক্ষুধা লাগে, পেটের অন্ন সে কোথায় পাবে? যৌনক্ষুধা তার মনে জাগে, সে ক্ষুধা কেমন করে নিবৃত করবে? হালাল-হারামের জ্ঞান তার হয় না, সৃষ্টিকর্তাকে সে চিনে না, নিজেকে সে চিনে না, বেহেশ্‌ত-দোযখ, পরকাল সে চিনে না, বাপ সে চিনে না, মুরুব্বী মান্যতার জ্ঞান তার হয় না। সমাজের, জাতির বা ধর্মের দরদ তার নেই। বুদ্ধি তার আছে, মনস্তত্বে সে পারদর্শী, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা সে শুধু বিলাস-ব্যসন আর গরীব শোষণ ছাড়া দয়া-মায়া হায়ার চিন্তা করে না। কারণ ধর্মহীন শিক্ষার পরিণাম ধর্মদ্রোহিতা ও আত্মম্ভরিতা। ধর্মদ্রোহিতার পরিণাম বিলাস-ব্যসনের চিন্তা আর বিলাস-ব্যসন পূর্ণ হতে পারে না গরীব শোষণ ব্যতিরেকে। এই সত্যের প্রমাণ আমরা হাতেনাতে পাচ্ছি দুনিয়ার এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের অবস্থা দেখে। তারা সত্যাসত্য ভুলে পরের অন্ধ অনুকরণ করতেছে, দেশকে গরীব কঙ্কালসার বানিয়ে ঘুষের দ্বারা নিজেদের বিলাস-ব্যসনের সামান করছে। খোদাকে ভুলে, দীন শরী’ আতকে ভুলে মানুষের আকৃতি ধারণ করে, মানবতা বিবর্জিত হয়ে মানুষের রক্ত শোষণ করে যাচ্ছে। সমাজের নৈতিক বা আর্থিক উন্নতির কোন কর্মসূচীই তাদের মস্তিষ্কে বা অন্তঃকরণে জাগছে না। জাগলেও ধর্ম-শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা না থাকার কারণে তা কাজে পরিণত হচ্ছে না বা তা দ্বারা গরীব জনসাধারণও উপকৃত হচ্ছে না। এসব দুর্বিষহ বিষফল সবই খাঁটি ধর্মশিক্ষার অভাবে ফলছে।”

কতটুকু ইলম ফরজে আইন

সহীহ ভাবে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত এবং ফরজে আইন পরিমাণ ইলমের দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। ফরজে আইন পরিমাণ ইলমের অর্থ হলো-এ পরিমাণ ইলম হাসিল করা, যার দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সহীহ ও সুন্দর রূপে পালন করতে পারেঃ

(১) সহীহ আকায়িদ জানা এবং কুফর-শিরক সম্পর্কে অবগত হওয়া, যাতে দৃঢ় ঈমান হাসিল হয় এবং তা রক্ষা পায়।

(২) ইবাদত তথা উযূ-গোসল, আযান, ইকামত, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও আ’ দাত তথা খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম-ঘুম, বাজার-ঘাট ইত্যাদি সমস্ত দুনিয়াবী কাজ সমূহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সুন্নত মুতাবিক করা।

(৩) যে ব্যক্তি যে লাইনে জীবিকা নির্বাহ করে, সে লাইনের মাসআলা জেনে নেয়াঃ যাতে হালাল-হারাম বুঝতে পারে এবং হারাম রিযিক থেকে বাঁচতে পারে।

(৪) সকলের হক আদায় করা। বিশেষ করে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-

বোন পাড়া-প্রতিবেশী, দোস্ত-আহবাবদের হক আদায় করা। সব সময় ফিকির রাখা যে, নিজের কোন কাজ, কথা বা আচরণে অন্যের যেন কষ্ট না হয়। যার ব্যবহারে

অন্যরা কষ্ট পায়, সে ব্যক্তি হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী 'মুসলমান' উপাধি পাওয়ার যোগ্য নয়। কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করলে, জান প্রাণ দিয়ে তা রক্ষা করা। শরয়ী ওজর ব্যতীত কখনো কথার বরখেলাপ না করা।

(৫) নিজেরা অন্তরের রোগ সমূহের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। দুনিয়ার মোহ, হিংসা, বড়াই, বখিলী, রিয়াকারী ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সমূহের চিকিৎসার জন্য এবং ভালো ভালো সিফাত তথা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাব্বত, সবর, শোকর, ইখলাস ইত্যাদি হাসিল করার জন্য কোন হাক্কানী বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাকে নিজের দিলের অবস্থা বলে চিকিৎসা নেয়া জরুরী। দিলের রোগসমূহ সমস্ত গুনাহের মূল। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ফরজ। কিন্তু যতক্ষণ দিলের রোগের চিকিৎসা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত, নামায ইত্যাদিও সম্ভব নয়। সারকথা, উল্লেখিত কাজগুলো সকলেরই করতে হবে। আর সে সবের যথার্থ ইলমও সবারই হাসিল করতে হবে।

ইলম হাসিলের উপায় উপকরণ

ফরজে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা-তা যেভাবেই হোক, চাই মাদ্রাসায় পড়ে হোক, চাই দীনী কিতাব পড়ে, চাই উলামাগণ থেকে শুনে হোক তা প্রত্যেকের উপর ফরজ। আর প্রত্যেক এলাকায় কমপক্ষে একজন হাক্কানী আলিমের ব্যবস্থা করা এলাকাবাসীর উপর ফরজে কিফায়াহ।

পাশাপাশি শরীআতের বিধান হলো, যে জিনিস ফরজ, তার উপায়-উপকরণও ফরজ। তেমনিভাবে যে জিনিস হারাম, তার উপায়-উপকরণও হারাম। উক্ত উসূলের ভিত্তিতে যেহেতু দীনী মাদ্রাসা ছাড়া পরিপূর্ণভাবে সহীহ ইলম ও ইসলামের স্থায়িত্ব ও প্রচার-প্রসার বর্তমানে অন্য কোন ভাবে সম্ভব না, (বিস্তারিত দলীলের জন্য দেখুন- হযরত থানবী রহ.-এর কিতাব আল-ইলম ওয়াল উলামা-৫৩) সুতরাং দীনে ইসলামের স্থায়িত্ব ও প্রচার- প্রসারের জন্য এবং মুসলমানদের সহীহ ঈমান ও আমল বেঁচে থাকার জন্য মাদ্রাসা সমূহ কায়িম থাকা জরুরী।

মাদ্রাসা সমূহ হচ্ছে দীনের পাওয়ার হাউস। দীনের সকল লাইনের কর্মী মাদ্রাসা থেকে তৈরী হয়। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য পরিপূর্ণ দায়ী, ইলমে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য কামিল মুদাররিস-মুআল্লিম, নামাযের ইমামতের জন্য যোগ্য ইমাম, সহীহ জিহাদ পরিচালনার জন্য বিচক্ষণ সিপাহসালার, দীনী কিতাব-পত্র রচনার জন্য পারদর্শী লেখক এবং ইসলামী হুকুমতসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পরিচালনার জন্য যোগ্য খলীফাতুল মুসলিমীন ও নেতৃবৃন্দ এ সবই মাদ্রাসা থেকে সৃষ্টি হয়। দীনের পাওয়ার হাউস বন্ধ হয়ে গেলে, দীনের এ সব লাইনও বন্ধ হয়ে যাবে, অথবা গলতভাবে চলতে থাকবে। অবশ্য এ কথাও অনস্বীকার্য যে, যেমনভাবে দীনের পাওয়ার হাউস বা মাদ্রাসা থেকে কর্মী তৈরি হয়ে দীনের সকল লাইনে সহীহ ভাবে কাজ করে তেমনি

ভাবে দীনের বিভিন্ন শাখা লাইনের কাজের দ্বারা পাওয়ার হাউস টিকে থাকে। নতুবা পাওয়ার হাউস আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়। যেমনি-মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে উলামায়ে কিরাম যদি দুনিয়াদারীতে লেগে যান এবং দাওয়াত-তাবলীগ তা'লীম ও তাযকিয়ার কাজ সুষ্ঠুভাবে আনজাম না দেন এবং জনসাধারণের মধ্যে দীনী জাগরণ ও দীনের জযবা সৃষ্টি না করেন, তাহলে আস্তে আস্তে দেখা যাবে-মাদ্রাসায় কেউ আর ছেলে দিচ্ছে না বা সাহায্য পাঠাচ্ছে না। বরং সম্পূর্ণ পরিবেশ দীনের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তখন মাদ্রাসাগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে, উলামাগণও শহীদ হয়ে যাবেন। ফলে সে এলাকা থেকে দীন বিদায় নিবে। যেমন-রাশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ একথার প্রকৃষ্ট নজীর ও বাস্তব নিদর্শন।

ইলমী প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় মুসলিম মিল্লাতের যিম্মাদারী

দীনে ইসলামের স্থায়িত্বের জন্য খালিস দীনী মাদ্রাসা সমূহের বিকল্প নেই এবং জনগণের মধ্যে দীনী জাগরণ সৃষ্টি ছাড়া মাদ্রাসা সমূহের স্থায়িত্বের কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং দাওয়াত ও তা'লীমের উভয় মেহনত জারী রাখা এবং উভয়টির দিকে নজর রাখা জরুরী। এ উভয় দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলিম মিল্লাতের খিদমতে আমাদের আবেদন- যেহেতু বর্তমান প্রচলিত (জেনারেল) শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সুদূর পরাহত, তাই আমরা এমন পরামর্শ দিতে চাই, যেটা মুসলিম মিল্লাতের ক্ষমতার মধ্যে এবং একটু ফিকির করলেই তারা তা বাস্তবায়ন করতে পারবে। তা হচ্ছেঃ

(ক) প্রত্যেক গ্রামে বা মহলায় কমপক্ষে একটি ফুরকানিয়া বা আদর্শ মকতব (প্রাইমারী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) চালু করা। যার শিক্ষক নূরানী পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন বা অন্য কোন সহজ সরল বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন এবং শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা সম্পন্ন হবেন। দেশের বর্তমান অবস্থা এই যে, অধিকাংশ গ্রামেই ফুরকানিয়া মক্তব নেই। যদিও অধিকাংশ গ্রামে দুনিয়াবী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তারপরেও অল্প স্বল্প যা দু' চারটা মকতব মাদ্রাসা আছে, তার অনেক শিক্ষকগণ উপযুক্ত নন। অল্প বেতন দিয়ে নেহায়েত কম যোগ্যতার লোক নিয়োগ করা হয়। না তাদের কিরাআত ও তিলাওয়াত পুরা সহীহ থাকে, না তাদের পড়ানোর পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে, না তারা ছাত্র ধরে রাখতে পারেন, না ছাত্র গড়তে পারেন। বরং তাদের গলত আচরণে অনেক ছাত্র মাদ্রাসা ছাড়তে বাধ্য হয়। তাই মক্তব প্রতিষ্ঠা যেমন জরুরী, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করাও জরুরী।

(খ) প্রত্যেক ইউনিয়নের মধ্যে কমপক্ষে একটি কাফিয়া পর্যন্ত মাদ্রাসা (মাধ্যমিক দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠিত করা ইউনিয়নের দীনদার মুসলমানদের বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় লোকদের দায়িত্ব। তারা সম্মিলিত ফিকির ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ ধরনের বেসরকারী দীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন এবং এটাকে তারা দীনী দায়িত্ব ও ফরীজা মনে করবেন। এ দায়িত্ব পালন না করলে, আখিরাতে জবাবদিহীর সম্মুখীন হওয়ার

কথা মনে করে অবশ্যই তারা উলামাগণের সহযোগিতা নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) প্রত্যেক থানার মধ্যে কমপক্ষে একটি দাওরায়ে হাদীস (উচ্চ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) মাদ্রাসা কায়িম করা উক্ত থানার দীনদার লোকদের বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় লোকদের বিশেষ যিম্মাদারী। প্রশাসনিক ও লোকাল যেসব গণ্যমান্য লোকজন আছেন, তারা যদি এলাকার লোকদের শুধু দুনিয়াদারীর বিষয় নিয়ে ফিকির করেন এবং তা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে তারা আল্লাহ্‌র দরবারে কখনো জওয়াবদিহী করে কামিয়াবী পাবেন না। কারণ- কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, এটাই আল্লাহ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ যে, যারাই মুসলিম মিল্লাতের জিম্মাদার বা নেতা হবেন, তারা মুসলমানদের দীন ও দুনিয়া উভয়টার উন্নতির ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবেন। এলাকার লোকদের দুনিয়াবী জরুরত ও কল্যাণ নিয়ে যেভাবে ফিকির করেন, তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব সহকারে ফিকির করবেন যে, প্রত্যেকটা মুসলমানের ঈমান-আক্বীদা, নামায-কুরআন কিভাবে দুরস্ত হবে, তার জন্য কি ব্যবস্থা করা দরকার এবং তাদের ঈমান-আকীদার হিফাজত কিভাবে হবে, কোন বাতিল ফিরকা বা অমুসলিম এন.জি.ও. মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা খারাপ করছে কিনা? কোন দুরাচার, আল্লাহ্, রসুল, কুরআন, দীন ইসলাম ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে কি না? করলে সেগুলোকে কঠোর হস্তে দমন করার যিম্মাদারী প্রশাসনের উপর ও নেতৃস্থানীয় লোকদের উপর বর্তাবে। তারা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, এলাকার দীনদার মুসলমানগণ তাদেরকে এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবেন। অথবা ক্ষমতা বা নেতৃত্ব থেকে তাদেরকে অপসারিত করে যোগ্য লোকদেরকে ক্ষমতায় বসাবেন।

বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয়, বর্তমানে যারা প্রশাসনে আছেন বা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা নিজেদেরকে শুধু জনগণের দুনিয়াবী বিষয়ের জিম্মাদার মনে করেন। তাই তাদেরকে মুসলমানদের দীন-ঈমান নিয়ে তেমন কোন ফিকির করতে দেখা যায় না। কিন্তু তাদের এ ধারণা কুরআন-হাদীসের সম্পূর্ণ খিলাফ। বরং কুরআন-হাদীস দ্বারা বুঝা যায়- প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীকে গোটা দেশের লোকদের দীন ঈমানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং এ ব্যাপারে তিনি কি যিম্মাদারী আদায় করেছেন, তার কৈফিয়ত চাওয়া হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে জিলা প্রশাসক, থানা প্রশাসক, এমপি ও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং গ্রামের মেম্বারগণ স্ব স্ব গন্ডিভূত জনসাধারণের এবং গৃহস্বামী বাড়ির সকলের দীনদারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।

যেমন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “শুনে রাখ, তোমরা প্রত্যেকেই যিম্মাদার এবং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ যিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। লোকদের শাসকগণ যিম্মাদার, তারাও তাদের যিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” (বুখারী শরীফ, ২/১০৫৭)

এক্ষেত্রে যিম্মাদারীর অর্থ হচ্ছে, প্রজাদের দীনী ও দুনিয়াবী ব্যাপারে যথার্থ কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা।

অতঃপর এক হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- “মুসলমানদের কোন শাসক যদি তার প্রজাদের দীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ সাধন ব্যতীত মৃত্যুবরণ করেন, তবে মহান আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।” (বুখারী শরীফ, ২/১০৫৮)

সুতরাং শুধু দুনিয়াবী দায়িত্ব পালন করে এসব জিম্মাদারগণ কখনো দায়িত্ব মুক্ত হতে পারবেন না। তাই তারা ও এলাকার অন্যান্য নেতাগণ এবং সকল স্তরের দীনদার মুসলমানগণ মিলে দীন-কুরআন কায়িমের প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা কায়িমের ব্যাপারে অবদান রাখবেন। উল্লেখিত কোন সম্প্রদায় যদি তাদের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেন বা আদৌ দীনী দায়িত্ব পালনে অগ্রসর না হন, তাহলে সাধারণ মুসলমানগণ এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন। অন্যদের অনীহার কারণে তারা দায়িত্ব মুক্ত হবেন না। বরং তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী দীনী দায়িত্ব আদায় করে যাবেন, যাতে করে হাশরের ময়দানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অভিযোগের মধ্যে না পড়েন। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان: ٣٠)

“কিয়ামতের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক উম্মতের বিরুদ্ধে এ বলে অভিযোগ পেশ করবেন যে, হে আমার পালনকর্তা! আমার উম্মতগণ এ কুরআন শরীফকে উপেক্ষা করেছিল অর্থাৎ তাকে কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা করেনি।” (সূরাহ ফুরকানঃ ৩০)

(ঘ) প্রত্যেক জেলার মধ্যে কমপক্ষে একটি জামিআ (সর্বোচ্চ ডিগ্রি সমন্বিত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) কায়িম করা উক্ত জিলার দায়িত্বশীল ও দীনদার লোকদের বিশেষ যিম্মাদারী। তারা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে

জেলার মধ্যে এ ধরনের জামিআ প্রতিষ্ঠিত করবেন, যেখানে মাওলানা পাশ করার পর মুফতী, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ইত্যাদি দীনী শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে দারুল ইফতা তথা ফাতওয়া বিভাগ থাকবে, যেখান থেকে দীনের সব ধরনের সমস্যার সমাধান দেয়া হবে এবং এ প্রতিষ্ঠান থেকে এলাকার লোকদের সব ধরনের দীনী প্রয়োজন পূর্ণ হবে। কোন জটিল মাসআলার জন্য জনগণকে বহু কষ্ট করে রাজধানী বা বিভাগীয় শহরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন, থানা, জিলা এসব পরিভাষা কুরআন হাদীসে যদিও নেই, তবে যতটুকু দূরত্বের মধ্যে দীনী প্রয়োজন মিটানোর যে ব্যবস্থা শরীয়তে বর্ণিত হয়েছে, তা রিসার্চ করলে, উপরে বর্ণিত এলাকা ভিত্তিক দায়িত্ব সমূহের প্রমাণ পাওয়া যায়।

গণ্যমান্য লোকজন ও মুসলমান জনসাধারণ উলামায়ে কিরামের সহযোগিতায় উক্ত মাদ্রাসা সমূহ কায়িম করবেন এবং নিজেদের সন্তানদের দিয়ে ও আর্থিক সহযোগিতা নিজেরা সেখানে যেয়ে পৌঁছায়ে এসে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করে প্রতিষ্ঠান সমূহ কায়িম রাখতে সচেষ্ট হবে।

বর্তমান উলামাগণ মাদ্রাসার চাঁদার জন্য জনগণের দুয়ারে দুয়ারে হাজির হন, এটা নিঃসন্দেহে ভালো সুরত নয়। এটা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয় যে, তারা উলামায়ে কিরাম-যারা তাদের মাথার তাজ এবং ধর্মীয় জিম্মাদার, তাদেরকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে হটিয়ে তাদের মূল্যবান সময়-যা জনগণের দীনী সেবার জন্য ওয়াকফকৃত ছিলো, তা নষ্ট করে এমন একটা মামুলী কাজে লাগাতে বাধ্য করছেন, যা সামান্য একজন চাকর-নওকর দ্বারাও সম্ভব। প্রত্যেকে ইচ্ছা করলে, নিজের দীনী দায়িত্ব আদায়ের লক্ষ্যে নিজের একজন লোকের মাধ্যমে তার সাহায্য-সহযোগিতা মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে উলামাগণের অনেক সময় বেঁচে যাবে। সে সময়টা তাঁরা জনগণের দীন-ঈমান, উযূ-নামায ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যয় করতে পারবেন। সকলেই জানে যে, মশা মারার জন্য কামান দাগানোর প্রয়োজন নেই। তাই যার জন্য যে কাজ শোভনীয় তার দ্বারা সে কাজই নেয়া উচিত। এ হল জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মাদ্রাসা সমূহের যিম্মাদারী

উল্লেখিত মাদ্রাসাগুলো দীনের মারকায বা কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। উক্ত মাদ্রাসাগুলোতে শুধু ছাত্রদেরকে পড়ানোই হবে না, বরং মুসলমানদের ঈমান-ইসলাম কায়িম এবং দীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ও হিফাজতের সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণ করবে। উভয় যিম্মাদারীর তাফসীল নিম্নরুপঃ

মাদ্রাসার দুধরনের দায়িত্ব রয়েছে, ১. বুনিয়াদী দায়িত্ব ও ২. আনুষঙ্গিক দায়িত্ব।

মাদ্রাসার বুনিয়াদী দায়িত্ব

তালীম-তরবিয়্যতঃ দীনী মাদ্রাসা সমূহের বুনিয়াদী দায়িত্ব হলো-তালিবে ইলমদের তালীম ও তরবিয়্যত। তালীম অর্থ-কুরআন, সুন্নাহের পরিপক্ক ও পারদর্শী আলেম বানানো এবং তরবিয়্যত অর্থ-কুরআন, সুন্নাহর ইলম অনুযায়ী তাদের আখলাক-চরিত্র গঠন করা। প্রকৃত পক্ষে ইলমে দীন হাসিল করার উদ্দেশ্য এটাই। নতুবা আখলাক-আমল বিহীন ইলম মূল্যহীন। বরং এ ধরনের ইলম মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং এরূপ ইলম থেকে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে পানাহ চেয়েছেন। সুতরাং তরবিয়্যতকে হালকাভাবে দেখার কোন উপায় নেই। জেহেন জাকাওয়াত হিসাবে ইলম সকলের মধ্যে এক সমানভাবে আসে না। কিন্তু চরিত্র সংশোধন, সুন্নতের অনুসরণ, দীনী জযবা সকলের মধ্যে পূর্ণ ভাবে আসতে পারে এবং আসা জরুরীও বটে। কিন্তু আফসোস এবং দুঃখজনক যে, পরিচালকগণের ফিকিরের অভাবে দীনী মাদ্রাসা সমূহের মধ্যে তরবিয়্যতের সাইডটি বিলুপ্ত প্রায়। এ

কারণে প্রতি বৎসর অনেক আলেম তৈরী হওয়া সত্ত্বেও দীনী পরিবেশের মধ্যে কাঙ্খিত উন্নতি সাধিত হচ্ছে না। যারা তৈরি হচ্ছে, তাদের অনেকে কালস্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে আমাদের আকাবিরগণ তা'লীম ও তরবিয়্যত উভয়টা জরুরী মনে করা সত্ত্বেও তরবিয়্যতের ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দিতেন।

উপযুক্ত উস্তাদঃ মাদ্রাসার তা'লীম উন্নত করার জন্য মুহাক্কিক, পারদর্শী উলামাগণের হাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ্য উস্তাদ জরুরী। এ ছাড়া গতানুগতিক তালীম দ্বারা তালীমের মান উন্নত করা কখনো সম্ভবপর নয়।

প্রশিক্ষণ ছাড়া একজন উস্তাদের জন্য বিশেষ করে নতুন শিক্ষকদের জন্য ছাত্র গড়া অসম্ভব বলা চলে। আর ছাত্রদের তরবিয়্যতের জন্য এমন উস্তাদ-শিক্ষক জরুরী, যিনি চরিত্রবান আমলওয়ালা এবং সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী হবেন। সর্বোপরি তিনি এমন হবেন যে, কোন আল্লাহ্ওয়ালা হাক্কানী বুযুর্গের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি নিজের আত্মশুদ্ধি করিয়েছেন, নিজের ভিতর আল্লাহ্র মুহাব্বাত, তাকওয়া-পরহেজগারি অর্জন করেছেন এবং নিজের আকল, আদাত ও আমলের ইসলাহ করেছেন। এ ধরনের সুযোগ্য শিক্ষক ছাড়া ছাত্রদের সহীহ তরবিয়্যত সম্ভব নয়। কারণ- ছাত্ররা শিক্ষকগণের নসীহতের তুলনায় তাদের যুক্তিগত আমল ও আখলাকের অনুসরণই বেশী করে থাকে। আর এটাই তাদের স্বভাব। সুতরাং সৎ চরিত্রবান শিক্ষক ব্যতীত ছাত্রদের আখলাক ও আমল দুরস্ত করা সম্ভব নয় এবং এ ধরনের শিক্ষক ব্যতীত তা'লীম-তরবিয়্যতে কোন বরকত ও নুর পয়দা হয় না। বরং এ ধরনের শিক্ষকের অভাবে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নানা ধরনের ফিৎনা ও সমস্যা হতে পারে। যার সমাধান হয়ত কঠিন হয়ে পড়বে এবং তার দ্বারা দীনেরও অনেক ক্ষতি সাধিত হবে। এসব কথা মাদ্রাসা পরিচালকগণের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট, ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সুতরাং উস্তাদগণের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও বুজুর্গগণের সুহবত প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য। এছাড়া সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মাদ্রাসা সমূহের আনুষঙ্গিক যিম্মাদারী

মাদ্রাসা সমূহের বুনিয়াদী দায়িত্ব বর্ণনা করার পর এমন কিছু দায়িত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলো মাদ্রাসার পরিচালকগণের সরাসরি করার প্রয়োজন নেই, তবে তাদের একটু ফিকির ও ইন্তিজাম করে দেয়া জরুরী। এটা তাদের জন্য কোন বোঝা হবে না, অপর দিকে দীনের বৃহৎ অতীব জরুরী এমন কতিপয় খিদমত আনজাম পাবে, যা অন্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। মাদ্রাসার সেই সকল আনুষঙ্গিক দায়িত্ব সমূহ হচ্ছেঃ

(ক) কিতাবী তালীমঃ এলাকার প্রত্যেক মসজিদে হযরত থানবী রহ.-এর তালীমুদ্দীন কিতাব থেকে আক্বায়িদের বয়ানের তা'লীম শুরু করতে হবে এবং কুফর, শিরক ও গুনাহে কবীরার বয়ান শুনাতে হবে। এতে লোকদের ঈমানঃ আক্বীদা দুরস্ত হয়ে যাবে এবং সমাজে যত বাতিল ফিরকা আছে, যেমন- কাদিয়ানী ফিতনা, শিয়া ফিতনা,

মওদুদী ফিতনা, রিজভী ফিতনা এসব বন্ধ হয়ে সহীহ মতাদর্শ কায়িম হবে। জনগণের মধ্যে সহীহ আক্বীদা না থাকায় এ সব বাতিল মতবাদ জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পাচ্ছে।

(খ) দাওয়াত ও তাবলীগঃ মাদ্রাসাগুলো তাবলীগী মারকাযের ভূমিকা পালন করবে অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকগণ পড়াশুনার মধ্যে কোন ক্ষতি না করে শুক্রবার বা ছুটির সময় কিংবা বাদ আসর কিছু সময় বের করবেন। তারা এ সময় এলাকার লোকদের দাওয়াত দিয়ে মসজিদে জমা করবেন এবং তাদেরকে ঈমান, নামায ইত্যাদির গুরুত্ব বুঝিয়ে এগুলো শিক্ষা লাভের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান-মাল নিয়ে বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। এভাবে তাদেরকে তৈরি করে জামা' আত বানিয়ে আমীর ঠিক করে আল্লাহর রাস্তায় বের করার নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা করবে, তবে সবই তাবলীগী উসূলের ভিত্তিতে করবেন, তাতে পরীক্ষিত বরকত রয়েছে। নিজেদের খুশিমতো কিছু করবেন না।

(গ) নূরানী বয়স্ক প্রশিক্ষণঃ প্রত্যেকটি মাদ্রাসা নূরানী তালীমের মারকায হতে হবে। অর্থাৎ মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবসহ সকল শিক্ষক ও বড় ছাত্রগণ সময় সুযোগমত নূরানী মুআল্লিম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে যোগ্য মুআল্লিম হিসেবে তৈরি করবেন। মাদ্রাসা চালু অবস্থায় মুহতামিম সাহেব উস্তাদগণের দ্বারা এলাকার মসজিদগুলোতে পর্যায়ক্রমে নূরানী বয়স্ক ক্লাস চালু করবেন। ২০ বা ৪০ দিনের একাটি একটি কোর্স এক এক মসজিদে চালু করে প্রতিদিন ১ঘন্টা করে মুনাসিব কোন সময় এলাকার লোকদের সাথে সাথে পরামর্শ করে ঠিক করবেন। সেই সময়ে উক্ত দরসে কুরআন কারীমের শিক্ষা দেবেন। এভাবে এলাকার সকল মসজিদে বয়স্কদের জন্য কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। যাতে করে এলাকার মধ্যে কোরআন শিক্ষা বিহীন মুসলমান অবশিষ্ট না থাকে। এটাকে টার্গেট বানিয়ে মেহনত চালিয়ে যাবেন। আর লম্বা বন্ধের সময় ছাত্র-শিক্ষকগণ নিজেদের বাড়ীর এলাকায় এ কোর্স চালু করবেন। তার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা সাথে সাথে মাদ্রাসার মধ্যে দীনী ছাঁচে আধুনিক শিক্ষা লাভের জন্য একটা সেকশন থাকতে হবে। যাতে করে ছাত্র-শিক্ষকগণ প্রাঞ্জল মাতৃভাষায় দীন উপস্থাপনের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

(ঘ) দাওয়াতুল হক এর কার্যক্রমঃ প্রত্যেকটা মাদ্রাসা হযরত থানবী রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মজলিসে দাওয়াতুল হকের মারকায হওয়া বাঞ্ছনীয়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির ইসলাহের ধারা পরম্পরায় সমাজের ইসলাহ। অর্থাৎ দীনের সকল ক্ষেত্রে এবং জীবনের সকল স্তরে সুন্নত কায়িমের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ থেকে সমস্ত শিরক, বিদআত ও কু-প্রথার মূলোৎপাটন করা এবং উযূ-গোসল, আযান-ইকামত, নামায-কালাম, বিবাহ-শাদী, কাফন-দাফন সব কিছু বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহীহ ভাবে সমাজে চালু করা। এভাবে প্রত্যেক মসজিদে সুন্নতের তালীম চালু করা কর্তব্য। এছাড়াও এলাকার সমস্ত ইমামগনকে এজন্য তৈরি করতে হবে যে, তারা প্রত্যেকে

নিজের মহল্লার সকল বালেগ পুরুষদের তালিকা তৈরি করবেন যে, তার এলাকায় মোট এতজন লোক বসবাস করেন এবং তার মধ্যে এত জন জামা' আতের সহিত নামায পড়েন, আর এতজন নামায পড়েন, কিন্তু ঠিকমত মসজিদে আসেন না এবং এতজন এখনো নামাযই শুরু করেননি। অতঃপর জামা' আতের নামাযী মুসল্লীদের সহযোগিতায় অবশিষ্টদেরকে খুসুশী গাশ্ত ও বাড়ীতে বাড়ীতে যেয়ে সংক্ষিপ্ত বয়ানের মাধ্যমে মসজিদের জামা' আতে সাথে জুড়ে দিবেন এবং তাদেরকে হাতে কলমে উযূ, নামায সব কিছু শিখিয়ে দিবেন। পাশাপাশি পর্দার সহিত নসীহতের ব্যবস্থা করে বয়ানের মাধ্যমে মা-বোনদেরকেও দীনের জরুরী কথা ও তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন। যাতে করে মা-বোনদের কেউ বেনামাযী না থাকতে পারে। এটাকে টার্গেট বানিয়ে মেহনত করতে থাকতে হবে। কতটুকু কাজ হলো, সেদিকে লক্ষ্য করলে কিন্তু কাজ করা যাবে না; বরং মনে রাখতে হবে, হিদায়াত আল্লাহ তা'আলার হাতে। আমাদের দায়িত্ব শুধু মেহনত চালিয়ে যাওয়া।

মোটকথা, দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী যা জামিদআ রাহমানিয়া-মুহাম্মদপুর মাদ্রাসা থেকে প্রকাশিত রাহমানী পয়গাম এপ্রিল ৯৫ প্রশ্ন-উত্তর পর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করতে হবে। মাদ্রাসা খোলা অবস্থায় শিক্ষক-ছাত্রগণ মাদ্রাসার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কাজ করবেন এবং বন্ধে এক গ্রুপ তাবলীগে সময় লাগাবেন। অবশিষ্ট সকলে নিজের বাড়ীর এলাকায় বা আত্মীয় স্বজনদের এলাকায় নামায ইত্যাদির বাস্তব প্রশিক্ষণের নিয়তে বাড়ীতে যাবেন। বেড়ানো তো এমনিতেই হয়ে যাবে, তার জন্য নিয়ত করার দরকার পড়ে না। আর এর দ্বারা সূরাহ তাওবা ১২২ নং আয়াতের উপরও আমল হয়ে যাবে।

(ঙ) প্রাইমারী সেকশনঃ মাদ্রাসাগুলোতে সাধারণ শিক্ষার প্রাইমারী সেকশন চালু করতে হবে। দীনী কওমী মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে হিফয ও মকতব শাখার মত একটি ভিন্ন শাখা থাকতে হবে প্রাইমারী শাখা। যেখানে আশপাশের বাচ্চাদেরকে দীনী তা'লীমের সাথে আধুনিক শিক্ষাও দান করা হবে। উক্ত সেকশন কমপক্ষে প্রাইমারী পর্যায়ের হবে। আধুনিক পর্যায়ের হলে অতি উত্তম। তা মূলতঃ সাধারণ জনগণের জন্য নিছক আধুনিক শিক্ষার বদলে আধুনিক ও দীনী উভয় শিক্ষার সমন্বিত একটি ধারা প্রয়াস হবে। এ সেকশনের সিলেবাস উলামায়ে কিরামগণ দীনদার বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় তৈরী করবেন। এ সিলেবাসের মূল লক্ষ্য হবে, স্কুল-কলেজ মুখী ছাত্ররা আধুনিক শিক্ষার মধ্যে দিয়েই দীনী তরবিয়্যত পেয়ে যেন পাক্কা সাচ্চা মুমিন মুসলমান হয়ে বের হতে পারে অর্থাৎ একটি ছেলে এমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে না, যে দীনের ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ থাকে। বরং ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও হবে, দীনের ব্যাপারেও অভিজ্ঞ হবে। এর জন্য এমন সিলেবাস হবে যার মধ্যে দীনের বুনিয়াদী সকল বিষয়, যেমন-আকায়িদ, ইবাদত, মুআশারাহ ও আখলাক ইত্যাদির উপর কিতাব/বই-পুস্তক থাকবে এবং তার সাথে মাতৃভাষা ও ইংরেজীসহ অন্যান্য বিষয়ের

বই-পুস্তক সন্নিবেশিত থাকবে। এতে যারা পড়াবেন, তারা প্রত্যেকে দীনদার দীনী ইলম সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ হবে।

প্রত্যেক কওমী মাদ্রাসার সাথে এ সেকশন চালু করা এ জন্য জরুরী যে, কওমী মাদ্রাসার মাধ্যমে দাওয়াত-তাবলীগ, খানকাহ ইত্যাদির সহিত সম্পৃক্ত সীমিত লোকদের একটি তবকার সন্তানরা দীনের আলো পাচ্ছে। অপরদিকে তাদের বাইরের অধিকাংশ শিশু-কিশোর অভিশপ্ত ও উদ্ভট সিলেবাস ও কুশিক্ষার দরুন দীনের কোন আলো বা ছোঁয়া পাচ্ছে না। তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। পরন্তু এসব দীন বিমুখ ছেলেরা খ্রীষ্টান-মিশনারীদের বড় বড় নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রীর কারণে ভবিষ্যতে প্রশাসনের বিভিন্ন দায়িত্বে এবং দেশ পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করছে। অথচ দীনী ব্যাপারে অজ্ঞতার দরুন মুসলিম সমাজকে দীনের কিছুই তারা দিতে সক্ষম হচ্ছে না । কারণ-যে নিজেই ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ কোন ধারণা রাখে না, সমাজকে সে কি দিবে? বরঞ্চ বিতর্কিত বুঝের কারণে অনেকাংশে তারা দেশ ও সমাজকে দিনের পর দিন ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের অনেকে নিজেদের সামান্য সুবিধার বিনিময়ে মুসলমানদের দীন-ইমান এবং দেশের সার্বভৌমত্বকে পর্যন্ত দুশমনদের পদতলে বিকিয়ে দিতে দ্বিধা করছে না।

এ অবস্থায় পরিবর্তন করতে হলে, উলামায়ে কিরামের নেতৃত্বে পরিশোধিত আধুনিক ও দীনী শিক্ষার সম্পূরক সিলেবাসের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়া উপযুক্ত ও যোগ্য লোক তৈরির কোন বিকল্প নেই। বিষয়টি যদিও ব্যাখ্যার দাবী রাখে, কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসরের এ প্রবন্ধে ইশারা দেয়া ছাড়া বিস্তারিত বুঝানোর অবকাশ নেই।

প্রতিটি মাদ্রাসার মধ্যে বেশীর ভাগ ছাত্রই দেখা যায় দূরবর্তী এলাকার। মহল্লার ছেলে খুবই কম পাওয়া যায়। যে কারণে মহল্লাবাসী সাধারণতঃ মাদ্রাসাগুলোর সাথে জুড়তে চায়না। নিজেরা সাহায্য পৌঁছায় না। উলামায়ে কেরামগণ সাহায্য-সহযোগিতা করলেও দিতে আগ্রহী হয় না। বিপদ-আপদে তাদেরকে মসজিদ-মাদ্রাসার পাশে পাওয়া যায় না। উল্লেখিত ব্যবস্থার দ্বারা পুরা এলাকাবাসী মাদ্রাসার সাথে জুড়ে মাদ্রাসার সহযোগী হয়ে যাবে। হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. এ কারণে বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন।

(চ) মেয়েদের দীনী ইলম শিক্ষার ব্যবস্থাঃ মাদ্রাসার জিম্মাদারগণকে মাতৃজাতির তালীমের জন্য বাস্তব মুখী যথার্থ পদক্ষেপ নিতে হবে।আমাদের সমাজে মা-বোনেরা পুরুষের জন্য অজস্র মেহনত করা সত্ত্বেও দীনী তা'লীমের ব্যাপারে তারা নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিত। যার দরুন সমাজের সকল বিবেকবান মুসলমান আল্লাহ্‌র দরবারে দায়ী হবে। তাদেরকে দীনী তা'লীম দেয়া এবং সমস্ত ফিৎনার সয়লাব থেকে তাদেরকে হিফাজত করা পুরুষদের দায়িত্ব। আজ তারা দীনের ব্যাপারে নিতান্ত জাহিল থাকার কারণে না নিজেরা সঠিক ভাবে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে, না সন্তানদের তৈরী করতে পারে, না তার কাছে বিভিন্ন জরুরতে আগমনকারীণী

মহিলাদের মধ্যে দীনী জেহেন তৈরি করতে পারে। বরং সাংসারিক কিছু কাম-কাজ করে অবশিষ্ট সময় বাজে আলাপের মধ্যে তারা ব্যয় করে দেয়। এ অবস্থার অবসান হওয়া জরুরী। তারা যদি জাতিকে সুযোগ্য সন্তান উপহার দিতে না পারে তাহলে অদূরে ভবিষ্যতে এ সমাজ পরিপূর্ণ ভাবে ইংরেজদের তাবেদার জাতিতে পরিণত হবে। আর তারা সুযোগ্য সন্তান তখনই উপহার দিতে পারবে, যখন তাদের মধ্যে দীনের সহীহ ইলম ও আমল আসবে। এজন্য মাদ্রাসা সমূহের জিম্মাদারদের কর্তব্য, প্রত্যেকে নিজের বিবি, বোন, মেয়েকে সমাজের মহিলাদের খিদমতের জন্য যোগ্য মুআল্লিমা হিসেবে গড়ে তুলবেন এবং তাদেরকে দীনী ইলমের তা'লীমের খিদমতে নিয়োগ করবেন।

এর জন্য সূরত এই হওয়া চাই যে, প্রত্যেক আলেমের বাড়ীতে মহিলাদের তা'লীমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অথবা প্রত্যেক বড় গ্রামে ৫ বৎসর কোর্সের একটি করে বালিকা মাদ্রাসা কায়েমের ব্যবস্থা করবে, যেখানে মহিলাদের দীনী জরুরী বিষয়ের তা'লীমের পাশাপাশি দুনিয়াবী বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হবে, যাতে করে তারা সাংসারিক জরুরত সহজে পূর্ণ করতে সক্ষম হয় এবং বাচ্চাদের দীনী ইলম শিখাতে পারে। মহিলাদের জন্য সাইন্স, ভূগোল ইত্যাদির মত অপ্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ সিলেবাসের মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের দেশের মেয়েরা ১০/১১ বৎসরের আগে সাধারণতঃ বালেগা হয় না। সুতরাং উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত সিলেবাস অনুযায়ী পড়ার মাধ্যমে বালেগা হওয়ার পূর্বেই তারা জরুরিয়াতে দীন-এর শিক্ষা থেকে ফারিগ হতে পারবে। এতে কোন রকম ফিৎনা-ফাসাদের সম্মুখীন হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। এসব বালিকা মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ

করতে চেষ্টা করতে হবে। একান্ত মজবূরীর ক্ষেত্রে বয়স্ক দীনদার পরহেজগার পুরুষ শিক্ষক দ্বারাও তা'লীম দিতে পারবে। মেয়েদের উল্লেখিত ফরজে আইন পরিমাণ ইলমে দীন শিক্ষা দেয়ার পর তাদের কেউ যদি দীনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে নিজের বাপ, ভাই বা স্বামীর মাধ্যমে দীনী উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে। মহিলাদেরকে দলীল প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে দীন বুঝানোর জন্য এ ধরনের কিছু আলেমা মুআল্লিমা তৈরী হওয়া জরুরী। তবে এর জন্য ছাত্রীবাস খোলা এবং দীর্ঘদিনের জন্য বয়স্কা বা বালেগা মহিলাদেরকে একত্রে রাখা সমীচীন মনে হয় না। মেয়েদের দীর্ঘ মেয়াদী ইজতিমা বিশেষ ক্ষতির কারণ হতে পারে। যা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বুঝা যায়। শুধু মহিলাদের নামাযের জামাআত কায়িম করাও শরীআত পছন্দ করেনি। যা হোক এটা আমাদের পরামর্শ, ফাতওয়া নয়। কেউ যদি ফিৎনা-ফাসাদ থেকে পরহেজ করে পূর্ণ সতর্কতার সাথে ঘরোয়া আবাসিক পরিবেশে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে তারা নিজ যিম্মাদারীতে করতে পারে।

(ছ) দুঃস্থ মানবতার সেবাঃ মাদ্রাসার পরিচালকগণ স্বীয় মহল্লায় ইমাম সাহেবদেরকে এবং নিজেদের ফারেগীনদেরকে এভাবে তৈরী করবেন যেন তারা নিজের মহলার গরীব-দুঃখী ও বিপদগ্রস্ত লোকদের খোঁজ খবর রাখেন এবং তাদের অবস্থা জেনে ধনী মুসল্লীদের সাথে পরামর্শ ক্রমে তাদের সহায়তায় অচল ও উপার্জনক্ষম মুসল্লীদের আয়ের কোন সম্বল করে দেন। এভাবে তারা বেকার, নিঃস্ব ও বিধবা মহিলাদের জন্য কোন উপায়-সম্বল করে দিবেন। অচল, দরিদ্র, গরীবদের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিবেন। যারা কন্যাদায় গ্রস্ত, তাদের সহযোগিতা দান করবেন। এভাবে দুঃস্থ মানবতার সেবায় উলামায়ে কিরাম এগিয়ে আসলে, ইনশাআল্লাহ্ বিধর্মী এনজিওদের সকল পাঁয়তারা বন্ধ হতে বাধ্য হবে এবং খৃষ্টান বিশ্বের সকল স্বপ্ন সাধ ধ্বংস হয়ে যাবে। পরন্তু এ খিদমতের মাধ্যমে ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া হিসাবে উলামাগণের বিশেষ যিম্মাদারী আদায় হবে।

প্রকৃত পক্ষে এটি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। বিধর্মীরা এটিকে গ্রহণ করে বিশ্বের কর্তৃত্ব হাসিল করছে আর মুসলমানরা তাতে অবহেলা করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখিত কাজগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, বহু কাজ এবং অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, এগুলো কোন কঠিন কাজ নয়। উলামায়ে কিরামের মাদ্রাসা পরিচালনার ফাঁকে সামান্য ফিকির দ্বারাই এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে আনজাম পেতে পারে। সব কাজ তাদের নিজেদের করার দরকার হয় না, তারা শুধু নিজেদের ফিকির ও দিক নির্দেশনা দ্বারা কাজগুলোর ইন্তিজাম করে দিবেন। তাতেই ইনশাআল্লাহ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকবে। আর বিস্তীর্ণ ময়দানে ব্যাপক কাজের দরুন আপোষে মিল মুহাব্বাত সৃষ্টি হবে, ইখতিলাফ ও মতভেদের কোন ফূরসত বা সুযোগই থাকবে না এবং মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে ছাত্র ও অর্থ সংকট যে প্রকট, জনগণের মধ্যে দীন আসার দ্বারা তা নিশ্চিত ভাবে দুর হবে। তখন চাঁদার জন্য ইনশাআল্লাহ জনগণের দুয়ারে যাওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। বরং জনগণই নিজ দায়িত্বে এগুলো পৌঁছিয়ে দিবেন।

মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র

গ্রাম ও ইউনিয়নের মাদ্রাসা সমূহের জিম্মাদারগণ মাসে অন্ততঃ একবার থানা দাওরায়ে হাদীস মাদ্রাসায় নির্দিষ্ট তারিখে একত্রিত হবেন এবং এলাকার দীনী সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। সে সম্বন্ধে কেন্দ্র থেকে সমাধান গ্রহণ করবেন এবং সময়ের প্রেক্ষিতেও যামানার তাকাযা হিসেবে কখন কি করণীয়, তার দিক নির্দেশনা কেন্দ্র থেকে লাভ করবেন। তেমনিভাবে থানা পর্যায়ের মাদ্রাসাগুলোর জিম্মাদারগণ অন্ততঃ তিন মাসে একবার জিলা পর্যায়ের জামি’ আ কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে সমস্যার সমাধান ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবেন। এভাবে সব সময় সকল মাদ্রাসার মধ্যে

একটি গভীর সম্পর্ক বিরাজমান থাকতে হবে। এতে দীনী তা'লীম- তরবিয়্যত ও যামানার তাকাযা সবকিছু সুন্দর রূপে পূরণ হতে সহায়তা পাওয়া যাবে।

সবশেষে হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. জেনারেল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর জন্য যে সুপারিশ পেশ করেছেন, তা পাঠকের সামনে পেশ করে এ আলোচনার ইতি টানছি।

আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন (আমীন)। আমাদের দায়িত্ব সঠিক কথাগুলো সমাজের খিদমতে পৌঁছে দেয়া। কে কবুল করবেন, কে করবেন না এটা আমাদের দেখার বিষয় নয়।

দীনদার মুসলমান ও দায়িত্বশীল উলামাবর্গ বিশেষ করে মাদ্রাসা পরিচালকগণের যে যিম্মাদারী বর্ণনা করা হলো, এগুলো বাস্তবায়িত হলে, ইনশাআল্লাহ্ এ দেশের দীনী ও দুনিয়াবী হালাতের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে। জনগণের মধ্যে দীন আসবে, দীনী চেতনার সৃষ্টি হবে। পুরা দেশের মধ্যে দীনী জাগরণ শুরু হবে। তখন দীনের প্রাবল্যের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কুদরতে বাতিলকে মিটিয়ে দিবেন। দীনের নামে সকল গোমরাহী বন্ধ হবে এবং দীনী পরিবেশ কায়িম হওয়ার মাধ্যমে সকল অস্থিরতা, হানাহানী ও নৈরাজ্যতা বন্ধ হয়ে শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ কায়িম হবে। এটাই একমাত্র পথ সমাজের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের। এর বিকল্প মানে ব্যর্থতা, অকৃতকার্যতা। কারণ-আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উভয় জগতের সকল তরক্কী ও কামিয়াবী দীনের মধ্যেই নিহিত রেখেছেন।

এক্ষণে মুজাহিদে আজম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর সুপারিশগুলো হুবহু পেশ করছিঃ

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর সুপারিশ

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. বলন- ব্রিটিশ আমলে আশা কম ছিল এবং চেষ্টার পথও প্রশস্ত ছিল না। কারণ- তখন পরাধীনতার যুগ ছিল, ইংরেজ গভর্নমেন্টের আমল ছিল। এখন আমাদের নিজেদেরই গভর্ণমেণ্ট হয়েছে, আমরা আমাদের গভর্ণমেণ্টকে জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মুসলমান ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে, যাতে তারা ধর্মহীন হয়ে না যেতে পারে এবং ধর্মশিক্ষা হতে অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের পূর্ণজ্ঞান হতে বঞ্চিত না থাকে। এতটুকু চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। খাঁটি (ধার্মিক) ধর্মপ্রাণ জ্ঞানী আলেমদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা ও কম্যুনিজম, বে-আদবী, উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রভৃতির বিষ ঢুকতেছে, এ বিষ যাতে না ঢুকতে পারে, তার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি আমার ব্যক্তিগত মত এখানে প্রকাশ করছিঃ

১। প্রাইমারী ষ্ট্যান্ডার্ডে মুসলমান ছেলেমেয়েদেরকে বাধ্যতামূলক ভাবে পূর্ণ কুরআন শরীফ আদ্যোপান্ত শুদ্ধ করে চরিত্রবান ধার্মিক উস্তাদের দ্বারা পূর্ণ আদব রক্ষা করে পড়াতে হবে। মাধ্যমিক ষ্ট্যান্ডার্ডে মূল আরবী ভাষায় জ্ঞান জন্মিয়ে কুরআন শরীফের অর্থ পড়াতে হবে। উচ্চ পর্যায়ে মূল আরবী ভাষার জ্ঞানের সঙ্গে রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনকীর্তি অর্থাৎ একখানা হাদীসের কিতাব আদ্যোপান্ত উপযুক্ত চরিত্রবান ধার্মিক উস্তাদের দ্বারা পড়াতে হবে। প্রত্যেক পর্যায়ে পড়া এবং পড়ার পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমল-আখলাকের ও নৈতিক চরিত্র গঠনের অনুশীলন ও পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২। বাংলা-ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যেও নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা থাকতে হবে। বৈষয়িক শিক্ষার কোন পুস্তকে কোন কথা নীতিবিরোধী বা ধর্মবিরোধী হতে পারবে না। কঠোরভাবে এর বন্দোবস্ত করতে হবে।

৩। ধর্মহীন, চরিত্রহীন বা ধর্মবিরোধী কোন শিক্ষককেই শিক্ষা কাজের যোগ্য বলে গণ্য করা যাবে না।

৪। শিক্ষকের মর্যাদা বাড়াতে হবে।

৫। সহশিক্ষা বন্ধ করতে হবে। মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে। কেননা, যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার ফলে যুবকদের চরিত্র নষ্ট হবে, যুবতীদের সতীত্ব নষ্ট হবে, পাপের স্রোত প্রবাহিত হয়ে দেশ ও জাতি ধ্বংস হবে, ভবিষ্যত বংশধর নষ্ট হয়ে যাবে। চরিত্রহীন পিতার ঔরসে, অসতী মাতার গর্ভে কখনো সৎ সাহসী সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে না।

৬। বিজ্ঞানের নাস্তিকতা ভিত্তিমূলক পুস্তকগুলো আস্তিকতা ভিত্তিমূলক করে পুনরায় লেখাতে হবে।

৭। দর্শনের পুস্তকগুলো তুলনামূলকভাবে এমন শিক্ষকের দ্বারা পড়াতে হবে, যাদের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় আছে।

৮। যারা বৈষয়িক শিক্ষার সঙ্গে অথবা বৈষয়িক শিক্ষা বাদ দিয়ে ধর্ম

শিক্ষায় পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করে ধর্ম শিক্ষা এবং ধর্ম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করতে চাবে, তাদের বিশেষ সাহায্য-সহায়তা সমাজ ও হুকুমতের করতে হবে, যেমন অন্যান্য বিষয়ে করা হয়।

৯। বিদেশে (Foreign) পাঠাতে হলে, এমন ছেলে পাঠাতে হবে, যারা নিজের জাতীয় আদর্শে এত দৃঢ় যে, সে অন্যের ভিতরে সেই আদর্শ ঢুকাতে চেষ্টা করবে, অন্যদের আদর্শের দ্বারা যেন নিজে প্রভাবান্বিত না হয়। inferiority complex যেন তার ভিতরে না আসে।

১০। Class 1 (one) হইতে B.A. Class পর্যন্ত দুটি পেপার এবং ২০০ মার্ক প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এবং আরবী শিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হবে।

বৈষয়িক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি এভাবে কঠোর হাতে ধর্মশিক্ষার এক সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়, তবে আশা করা যায়, আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলা ও কমিউনিজম ঢুকতেছে তার সংশোধন হবে।

এ সূত্রে আমি এত দূর বলতে পারি না যে, সংশোধনের আশা আছে কি না? বা কি পরিমাণ আছে? কিন্তু গোলামীর যুগ অতিবাহিত হয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে চেষ্টার পথ প্রশস্ত হয়েছে, একথা বলতে পারি। সুতরাং চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। অন্যথায় নিজের ছেলে-মেয়েদের বিনা সংশোধনে কুসংসর্গে এবং কুশিক্ষার পরিবেশে পাঠিয়ে দেয়া যেন নিজের কলিজার টুকরাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা। তাছাড়া ছেলে-মেয়ে আল্লাহর তরফ হতে মা-বাপের হাতে আমানত। এই আমানতের খিয়ানত করলে, দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করলে, মহাপাপী হতে হবে। বাপের জন্য শুধু ছেলে ভবিষ্যত জীবনে কি খেয়ে বাঁচবে বা মেয়ের কিভাবে বিবাহ হবে, সেই চিন্তা করলেই দায়িত্ব পালন করা শেষ হল না। তাদের খাদ্যের এবং বিবাহের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চরিত্রের এবং ধর্মের ও ঈমানের চিন্তা করা ততোধিক জরুরী।” - শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.

উল্লেখ্য, অনেকে ২/১ বার নসীহত করেই ক্ষান্ত হয়ে যায় এবং বলে যে, আমিতো পিতা হিসাবে নসীহতের দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু কিভাবে? আমরা বলে থাকি, পরিবেশের কারণে আমার ছেলে কথা শুনছে না, তবে ছেলেটি সবদিক দিয়ে ভালো। কিন্তু একটু অসুবিধা, নামাযটা ঠিকমত পড়ে না। লোকদের এসব কথা একেবারেই অচল। আল্লাহ্ তা’আলা কুরআনে কারীমে নিজেকে এবং পরিবার-পরিজন ও সন্তানকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে আগুন বলার মধ্যে একটা মস্ত বড় হিকমত হলো নিজের ছেলে বা শিশু যদি আগুনের দিকে ধাবিত হয়- তাহলে কোন পিতা শুধু নসীহত করে ক্ষান্ত থাকে না এবং একথাও বলবে না যে, আমিতো নিষেধ করেছি, তারপরেও আগুনে পড়লে আমার আর কি করার আছে? বরং পিতা যে কোন মূল্যে-ছেলেকে আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। তারপর দ্বিতীয় কথা হল, দীনী ক্ষতিকে সামান্য ক্ষতি বলা হচ্ছে। অথচ দীনী ক্ষতি সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এর উপর কোন ক্ষতি হতে পারে না। কিন্তু পিতা-মাতার দিলে দীনের যথার্থ মূল্যায়ন-ও গুরুত্ব না থাকায় এটাকে সামান্য ক্ষতি মনে করে তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। হাজারো পিতা-মাতা পাওয়া যাবে, যারা সন্তানকে চাকুরী-বাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য না করার কারণে রাগ করেন, কথা বন্ধ করেন। কিন্তু এমন কয়জন পিতা পাওয়া যাবে, যারা নামায না পড়ার কারণে, নামাযের জামা’ আত তরক করার কারণে সন্তানের উপর কখনও নারাজ হয়েছেন? সুতরাং সময় থাকতে

আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আজ পিতা সন্তানের চক্ষু খোলার সাথে সাথে তাকে নার্সারীতে পাঠিয়ে আল্লাহ্‌র নামের স্থলে কুকুর-বিড়ালের নাম শিখাচ্ছে। কুরআন শরীফের স্থলে ইংরেজী বই পড়াচ্ছে। সন্তানের প্রতি এ জুলুমের ফল পিতাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। পিতার সারা জীবনের মেহনতের ফল সেই সন্তান বাসস্থান বিল্ডিং থেকে অসুস্থতার অজুহাতে বের করে পিতাকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেবে। তারপর তার ব্যস্ততার দরুন সেখানে যেয়ে পিতার খোজ খবর নেয়ার ফুরসতও তার হবে না। এ অবস্থায় বহু পিতা নার্সিং হোমে ইন্তিকাল করছেন। এ সবের কারণ এটাই যে পিতা সন্তানকে এ তা'লীম দেন নাই যে- পিতা সন্তানের কত বড় দৌলত। দু'আ করি, সময় থাকতে সকলকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সহীহ বুঝ দান করুন। (আমীন)

ইলমে দীন শিক্ষার ব্যাপারে হযরত থানবী রহ. এর দিক নির্দেশনা

মনে রাখবে যে, মুসলিম জাতির বর্তমান বিবর্তন হচ্ছে একটি আত্মিক রোগ। দৈহিক রোগ ব্যাধি দেখা দেয়ার যেমন বিশেষ বিশেষ কারণ ও উপসর্গ থাকে এবং সে কারণ ও উপসর্গগুলো দূরীকরণ দ্বারাই রোগের চিকিৎসা করা হয়। তদ্রূপ এ আত্মিক রোগেরও (পরিবর্তনের) কার্যকারণ ও উপসর্গ রয়েছে। এ গুলো দুর করাই হচ্ছে এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে- এ রোগের কারণ ও উপসর্গগুলো চিহ্নিত করে তা দুর করার পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রচেষ্টা চালান। এখন আমরা এ দুটি বিষয়ের উপর আলোচনা করবোঃ

(এক) মুসলিম জাতির চারিত্রিক বিবর্তনের কারণ সমূহ চিহ্নিত করা প্রসঙ্গে চিন্তা, গবেষণা ও অনুসন্ধান করে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ই পাওয়া যায়ঃ

(১) মানুষের মধ্যে দীনী ইলম ও ইসলামী জ্ঞানের অভাব ও স্বল্পতা।

(২) মানুষের সাহস হীনতা অর্থাৎ দৃঢ় ইচ্ছার অভাব।

(দুই) এসব কারণ সমূহ দূর করার পন্থা। আর এটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এজন্য ঐকান্তিক আগ্রহ এবং শক্তি ও ক্ষমতাকে যৌথভাবে প্রয়োগের প্রয়োজন খুবই প্রকট।

সুতরাং উভয় কারণের প্রত্যেকটি কারণ দূর করার পন্থাও বিভিন্ন। অতএব, দীনী ইলমের অভাব দুর করার ব্যাপারে শিক্ষক, মুদাররিস, ছাত্র অর্থাৎ ইসলামী বিধানের জ্ঞানে পরিপক্ক উলামা এবং ছাত্র ও শাগরিদবৃন্দ সকলেরই ভূমিকা পালন করতে হবে। আর এ ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক কর্মসূচী।

পুরুষদের কর্মসূচী

শরী' আতের জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক লোকদের জন্য কর্মসূচী হচ্ছে- তাদের মধ্যে যাদের বেশী সময় সুযোগ রয়েছে, যেমন- ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, তারা তাদের সন্তানদেরকে ইলমে দীন শিক্ষা দিবে। তবে জীবন নির্বাহের তাগিদে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বৈষয়িক বিষয়ের জ্ঞান লাভে কোন দোষ নেই। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব জ্ঞান লাভ

করতে গিয়ে যেন শরী' আতের সীমারেখা অতিক্রম করা না হয়। এ পন্থা গ্রহণ করলেই সন্তানরা সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে।

আর নিজেরা একটি সময় নির্ধারণ করে কোন আলেম লোকের নিকট গিয়ে অথবা কোন যোগ্য তালেবে ইলমের নিকট গিয়ে বা ডেকে এনে তাদের কাছে ইলমে দীন শিক্ষা করবে। এটা করা সম্ভব না হলে কোন একজন সুবিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ অনুযায়ী বই/কিতাব ক্রয় করে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে, তা পাঠ করবে। শুধু একবার পাঠ করাই যথেষ্ট নয়। বরং দুই তিনবার পাঠ করে বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করবে। কিন্তু সেই বই/কিতাব এমন হওয়া চাই-যাতে দীনের সমস্ত দিক ও বিভাগ গুলোর আলোচনা বর্তমান থাকে। তাতে আকায়েদ, দীনীয়াত, মুআমালাত, মুআশারাত ও চরিত্র গঠন মুলক বিষয় লিপিবদ্ধ থাকা চাই।

আর যে সব লোক জীবিকা অর্জনের তাড়নায় এসবের বেশী সুযোগ পায় না এবং অক্ষর জ্ঞান ছাড়া জ্ঞান ও শিক্ষার সাথে কোন পরিচয় রাখে না, তারা নিজেরা এবং নিজেদের সন্তানদের জন্য আরবী জ্ঞান ব্যতিরেকে শুধু ধর্মীয় বই-পুস্তক সংগ্রহ করে একটা রুটিন অনুযায়ী তা নিয়মিত পাঠ করবে। একবার নয়, বার বার পাঠ করে বিষয়বস্তুকে নিজের স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করবে। এটা কোন শিক্ষকের কাছে গিয়েও করা যায়। অথবা নিজে নিজেও দুচার পৃষ্ঠা করে পাঠ করা যায়। বই পাঠ করতে গিয়ে কোন বিষয়বস্তু বোধগম্য না হলে, বই পড়া ছেড়ে দিবে না। বরং ঐ স্থানটি চিহ্নিত করে রেখে কোন সুবিজ্ঞ আলেমের নিকট গিয়ে বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিবে।

আর যাদের অক্ষর জ্ঞান বলতে কিছু নেই এবং তা সহজে আয়ত্বে আনারও অবকাশ নেই, তারা সপ্তাহে একদিন অথবা দৈনিক একবার কোন ইলমী মজলিসে গিয়ে বসাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিবে। আর কোন সুবিজ্ঞ আলেম বা আলেমের সাহচার্য গ্রহণকৃত এমন কোন লোকের দ্বারা পুস্তক চয়ন করাবে, যিনি পুস্তক সম্পর্কে ধারনা রাখেন। তবে আলেমের দ্বারা চয়ন করে নেয়াই উত্তম আর সপ্তাহের কোন এক এক দিন মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে জমায়েত হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় যেমন এক ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা ঐ পুস্তকটি একজন পাঠক দ্বারা পড়ায়ে শুনবে এবং ভালোভাবে বুঝে নিবেন। এ ভাবে পড়াবার ব্যবস্থা যদি বিনা পারিশ্রমিকে না পাওয়া যায়, তবে কিছু পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে একজন পাঠক সংগ্রহ করে নিবে। পাঠক ব্যক্তির বইয়ের কোন স্থানের বিষয়বস্তু বোধগম্য না হলে, স্থানটি চিহ্নিত করে রাখবে। অতঃপর কোন সুবিজ্ঞ আলেমের থেকে বুঝে নিয়ে পড়ে তা উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীদের শুনিয়ে দিবে।

কোন গ্রাম ও পল্লী অঞ্চলে এ ধরণের লোক না পাওয়া গেলে, পরস্পরের পরামর্শক্রমে চাঁদা উঠিয়ে তা দ্বার বাহির থেকে কোন লোক এনে তাকে শিক্ষকরুপে

মনোনীত করবে। অতঃপর এই নিয়মে তার দ্বারা বই কিতাব পড়িয়ে ইসলামী বিধান জেনে নিবে।

ইলমে দীন অর্জন বা বই পাঠ শ্রবণ ইত্যাদি ব্যাপারে সকলেরই নিম্নলিখিত দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখা অপরিহার্যঃ

(এক) প্রথমটি হচ্ছে- নিজের কর্ম ও অবস্থা সম্পর্কে যদি ইসলামের বিধান না জানা থাকে, তবে সাথে সাথে কোন হক্কানী আলেমের নিকট গিয়ে বিধান জেনে নিবে। দূরত্বের কারণে মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ না হলে, চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে তা জেনে নিবে। প্রতিদিন যদি মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে একটি মাসআলা জানা যায় তাহলে বছরে মোট সারে তিনশত মাসআলা জানা হয়। এভাবে দশ বছরে জানলে দশ বছরে জানা হয় সারে তিন হাজার মাসআলা। অনেক আলেম ব্যক্তিরও এত সংখ্যক মাসআলা জানা থাকে না। আর এরূপ করা কোন কঠিন কাজও নয়।

(দুই) দ্বিতীয় বিষয়টি হল, আলেমগণের মজলিসে যাওয়া। সে মজলিস খাস মজলিস হোক বা আম হোক। তাদের মজলিসে গিয়ে যা শুনবে তা ভালভাবে স্মরণ রাখার চেষ্টা করবে। এই হল পুরুষ লোকের ইসলামী জ্ঞান অর্জনের কর্মসূচীর বিবরণ। আল্লাহ পাক এই বিষয়গুলি বাস্তবায়ন করার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

সমাপ্ত